প্রকাশক :
শ্রীশ্যামল কুমার ঘোষ
ঘোষ পাবলিশিং কনসার্ন
২৯/২ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৩

মুদ্রক:
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
২নং ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতীম বিশ্বাস

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীমনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
করকমলে—

॥ উপস্থাপনা ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। / কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পয়ারবদ্ধ এই ছন্দময়তার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই এই বিরাট মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী—তার বিপুলতা, বৈচিত্র্য, গভীরতা, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান ও চিন্তা, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মাদর্শ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পেলাম মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য অনুবাদের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের সমগ্র জীবনচর্যায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মহাভারতের অবদান সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। কারও কাছে এটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ—এর প্রতিটি শব্দ পঙ্‌ক্তি অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত। প্রথাসিদ্ধ ধর্ম আর অন্ধবিশ্বাস গড়ে উঠেছে একে কেন্দ্র করে। পুরোহিত তন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র একে ব্যবহার করেছে আপন স্বার্থে। কেউ বলে মহাভারত শুধু কাব্য, কারও কাছে তা পুরাণ কথা, কেউ বলে ইতিহাস।

যে যেভাবেই গ্রহণ করুক না কেন, বিগত এক শতাব্দীতে ভারত চর্চায় মহাভারতের অনুশীলন, তার সামাজিক সংস্থান বা ঐতিহাসিকতা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা বহুভাবে হয়েছে। কিন্তু সেইসব প্রচেষ্টাগুলির বেশীর ভাগই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক এবং গবেষণালব্ধ তথ্য কিংবা বিশ্লেষণগত উপাদান। সবই ছিল বিদ্বৎ সমাজের এক্তিয়ারভুক্ত। আশার কথা, বিগত দুই দশক ধরে রামায়ণ মহাভারতের প্রামাণিকতা ও ঐতিহাসিকতা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সুরু হয়েছে এবং সেই বিতর্ক পণ্ডিতী আলোচনার পরিধি ছাড়িয়ে অযৌক্তিক অন্ধ আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে সাধারণ্যে প্রসারিত। আজ শুধু মহাকাব্যের ট্রাজিক ও নন্দনতাত্ত্বিক কিংবা শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ নয়—মহাকাব্যের ভাবাদর্শ, সমাজ-পরিস্থিতি, চিত্রকল্প বা পুরাণ অবয়বের চির আরাধ্য সৌধটি নানাদিক থেকে বিচারের ও তার ভিত্তিমূল অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চলছে। বলা যেতে পারে, শুরু হয়েছে এক গণবিতর্ক। এটা সমাজ-মনস্কতারই লক্ষণ। আলোচনায়, বিতর্কে অধিকারভেদের সীমা লুপ্ত হয়েছে। ঐতিহ্যবাদী আর প্রশ্নপ্রখর চিন্তাধারায়-বিশিষ্ট যুক্তিবাদী—উভয় পক্ষই বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ও দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকাব্যদ্বয়ের মূল্যায়নে ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সক্রিয়।

এই অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য এ কারণে যে তথ্যগত ভিত্তিছাড়া ঐতিহ্য মূল্যহীন। একে মিথ্ বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না কারণ এর মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজ সভ্যতার নিগূঢ় বাস্তবতা; ফলে

নৃবিজ্ঞানের ধারণায় মিথ্ হয়ে উঠেছে মানব সভ্যতার এক শক্তিশালী উপকরণ। মিথ্ সম্পর্কে উনবিংশ শতকীয় ধারণায় গত কয়েক দশকে বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। সেই অর্থে মহাভারত শুধু পুরাণকাব্য নয়, বলা যেতে পারে পুরাণ-কথা—সাহিত্যের আঙ্গিকে রচিত ইতিহাস। উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৬ সালের ৩০শে মার্চ গোবিন্দবল্লভ পন্থ স্মারক বক্তৃতায় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় রামায়ণ ও মহাভারত: পুরাণকথা ও বাস্তবতা প্রসংগে মূল্যবান আলোচনা করে-ছিলেন।

যাই হোক, সমাজ-সচেতনতা, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের প্রয়োজন সম্পর্কে উপলব্ধি, সংস্কৃতি সম্পর্কে উন্নততর ধারণা, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কারণে আমাদের অতীত কাব্যপুরাণ উপকথা লোককথা লোকগাথা প্রভৃতি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমপ্রসারমুখী।

এই রকম পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বন্ধুবর মধু চট্টোপাধ্যায় চরিত্রের গভীরে আগ্রহী হয়ে পড়লেন, নানা জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত হলেন আর সেই আক্রমণের ফলশ্রুতিতে রচিত হোল 'মহাভারতে জন্মকথা।'

এই গ্রন্থে লেখক যে অনলস-অব্যাহত-অধ্যয়ন-অধ্যবসায়ের তন্নিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন ও পাণ্ডুলিপি রচনায় যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা আমার মত অলস অবসাদ গ্রস্ত লোকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। গ্রন্থটির পরিকল্পনার সূচনাকাল থেকে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়ার সময় পর্যন্ত গ্রন্থকারকে আমি উৎসাহিত করেছি সত্য কিন্তু সংগে সংগে এই আশঙ্কাও জেগেছে যে দুর্গাপুরে বসে এই ধরণের গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ সম্ভবপর হয়ে উঠবে কিনা। আমার আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হওয়াই আমি আজ সবচেয়ে খুশী। বলতে দ্বিধা নেই, আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তিনি বিরল-পরিশ্রমী, চরম আশা-বাদী ও ক্লান্তিবিহীন উদ্যোগী। কিন্তু তাঁকে এই গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দেওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে পরিণামে যে আমাকে এমন বিব্রত হ'তে হবে সে কথা আমি আগে বুঝিনি। বুঝলাম, যখন তিনি আমাকে তাঁর এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দেওয়ায় অধিকার তাঁর আছে এবং তা পালন করার চেষ্টা আমার তাবৎ জাগতিক কাজের মধ্যে পড়ে। তাই আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়েছি। যোগ্যতা বিচারের দায় তাঁর।

মহাভারতের বিচিত্র চরিত্র চিত্রশালার অগণিত আলেখ্য-র মধ্যে থেকে তিনি আটটি চরিত্র বেছে নিয়েছেন এবং তাদের রহস্যময় তথাকথিত অলৌকিক জন্মকথার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন কারণটিকে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ও আধুনিক প্রাগ্রসর চিন্তার আলোকে, যুক্তিসিদ্ধ মননে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন।

মহাভারত মহাকাব্যে জন্মরহস্য ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল এবং এই জন্মের জটিলতাই মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় কাহিনীটিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই মহাকাব্যের রচয়িতা ব'লে যিনি পরিচিত পরাশর-সত্যবতীর পুত্র সেই কৃষ্ণ—দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-এর জন্মবৃত্তান্তই রহস্যাচ্ছন্ন। জন্মজনিত কোন হীনমন্যতা বোধের অবচৈতনিক প্রক্রিয়ার ফলে এই মহাকাব্যের যাঁরা সবচেয়ে আদর্শ চরিত্র বলে প্রতিভাত, তাঁদের জন্মবৃত্তান্ত এমন কুহেলিকাপূর্ণ কোরে বর্ণনা করার পশ্চাতে সেই কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। এই দুই মহাকাব্যের চরিত্রের ও জন্মবৃত্তান্তের বিশ্লেষণে দেখা যায়, রামায়ণে একমাত্র সীতার জন্মবৃত্তান্তেই যা কিছু অপৌরুষেয়তা আছে কিন্তু মহাভারতের দুই বিবাদমান পক্ষ কৌরব ও পাণ্ডব কুলে—কৌরবদের স্বাভাবিক বংশ পরম্পরা; অন্যদিকে পাণ্ডব ও প্রচ্ছন্ন পাণ্ডব-পক্ষীয়দের অবৈধ না হ'লেও জটিল জন্মপ্রেক্ষিত। উভয়ের মধ্যে যে অন্তর্কলহ, তার মূলে রয়েছে সম্পত্তি ও শাসনক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব। একথা তো আমাদের জানা যে সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সঠিক জন্ম পরিচয় সমাজে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে—সম্পত্তির অধিকার সুনির্দিষ্ট করে। মহাভারতের তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটেও জন্মবৃত্তান্তের অস্বচ্ছতা ও অবিশ্বাস্য আবরণের মূলে নৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকা অসম্ভব নয়।

মহাভারতের কাহিনীকে যদি আমরা একালের পটভূমিতে সংস্থাপিত করি, তা'হলে দেখা যাবে পুরাণ অবয়বের খোলস ছাড়িয়ে তা হয়ে উঠেছে পার্থিব দ্বন্দ্বজটিল পরিস্থিতির বাস্তবে জড়িয়ে পড়া রক্তমাংসের মানুষের কাহিনী। এখানে বিপুল মানব জীবন বেগ সহস্রধারায় উৎসারিত উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সেই জীবন বেগের মধ্যে আছে মানব প্রবৃত্তির ও প্রাকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম অভিপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া

যায়। সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্প চতুর লোকের স্বহস্ত-রচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাব বিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে একদিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ, অসংযত অহংকার, অন্যদিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য চরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃ পরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃষ্ণ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমা পরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শ রক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালয়-মন্দয় আলোকে অন্ধকারে জীবন লক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানব সমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মত ছিল না। এবং বিপ্লব সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সবদা জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন বূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।"

মহাভারতের সমাজ ও সভ্যতা আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা নিয়ে মত্ত ছিল না এবং সে সময়কার ভারতবর্ষ 'নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তির' মত ছিল না। সুতরাং সেকালের সমাজে নৈতিক দৃষ্টিভংগী দেহগত শুচিতা সম্পর্কে ধারণা অন্যরকম থাকাই স্বাভাবিক। সকল যুগে সকল সমাজেই অবৈধ শিশুর জন্ম হয়েছে—অবৈধ এই কারণে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়নি। দেখা যাচ্ছে এর মূলে অর্থনৈতিক প্রশ্ন যতখানি জড়িত, নৈতিক প্রশ্ন ততখানি সম্পৃক্ত নয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তা ছিল সম্পত্তির অধিকারগত সুরক্ষা ও পরম্পরাকে অব্যাহত রাখতে। একালেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবে সফল ও স্বীকৃতি লাভ করলেও এই ধরণের শিশুর জন্মের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন ও সংশয় জাগছে। নৈতিকতার দাবী অগ্রাহ্য করে যে কারণটি সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে সেটি সামাজিক মর্যাদা। এই সামাজিক মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্যে পরিত্যক্ত শিশুর করুণ জীবন পরিণতি মানব সংসারে ও সমাজে বারবার দেখা দিয়েছে।

মহাভারতের চরিত-মালা থেকে অনেক চরিত্রকে আমরা তাদের জন্ম-বৃত্তান্তের জটিলতা ও অস্পষ্টতার জন্য চিহ্নিত করতে পারি। আগেই বলেছি,

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তার মধ্য থেকে আটটি চরিত্রের জন্মকথাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণেরও সূত্র হচ্ছে সে কালের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা যা এতাবৎ মোটামুটি বিভিন্ন গবেষণামূলক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে (সমস্ত সূত্র ও তথ্যকেই যে লেখন বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করতে পেরেছেন সে দাবী করা যায় না)। মূল মহাভারতের মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (বিশ্ববানী প্রকাশন), ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত ও সম্পাদিত সংস্করণ (সাক্ষরতা প্রকাশন), ৺পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহাভারত, ৺রাজশেখর বসুর মহাভারত ও কাশীরাম দাসের অনুবাদ সংস্করণ গুলি ও পাদটীকায় উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্কিত ধারণা ও যুক্তি সিদ্ধ মননশীলতায় বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রতিটি কাহিনী সম্পর্কে মূল্যায়ণ ও পরিপূরক আলোচনা আমার সাধ্যাতীত কারণ বুদ্ধিবৃত্তির যে নিরন্তর অনুশীলনে সে যোগ্যতা করতলে আমলকীবৎ আয়ত্ত থাকে, তা আমার অনায়ত্ত। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার ধারণা ও তার দু' একটি ক্ষেত্রে আমার বিচারবুদ্ধিতে যা মনে হয়েছে তার উল্লেখ কোরব।

লেখক আলোচ্য গ্রন্থে অলৌকিকতার ধোঁয়াটে আবরণকে ছিন্ন ক'রে প্রথাসিদ্ধ ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তিসিদ্ধভাবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে মহাভারতের সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে কালের শ্রেণীস্বার্থকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা রক্ষণশীল মূল্যবোধ আহত করলেও অনেক ভ্রান্তধারণা দূর করতে সহায়ক হবে। যে দানিকেন তত্ত্ব উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে ও প্রসারিত করতে সভ্যতার বিকাশে মানুষের গৌরব, ভূমিকা ও শক্তিকে তাৎপর্যহীন ক'রে দেখানোর—অপচেষ্টা কোরছে, তখন উক্ত তত্ত্বের মূলে আলোচ্য গ্রন্থটি আঘাত হানতে সমর্থ হবে বলে আশা পোষণ করি।

মহাভারতের রচনা কাল হিসাবে তিনি বহুজনের মতকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেই মতের ভিত্তি কি তার উল্লেখ নাই। এক্ষেত্রে যদি তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয়পক্ষে অংশগ্রহণকারী প্রায় ত্রিশটি জন ও জনপদের অস্তিত্বকালকে বিশ্লেষণ করতেন তা হলে মহাভারতযুদ্ধের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের কাছাকাছি বলে অনুমান করা নেওয়া যেত। যেমন কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে

পাণ্ডবদের পক্ষে বৎস, কাশী, চেদি, দশার্ণ, পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণি, আর কৌরবদের পক্ষে মগধ, অঙ্গ, বিদেহ, কোশল, মহিষ্মতী, অবন্তী, ভোজ-অন্ধক, নিষাদ, শল্য, বিদর্ভ, সিন্ধু-সৌবির, গান্ধার, ত্রিগর্ত, কেকয়, শিবি, মদ্র, বহ্লিক, ক্ষুদ্রক, মালব, অম্বষ্ঠ এবং কম্বোজ প্রভৃতি জন ও জনপদ যোগ দিয়েছিলেন। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এসে আমরা দেখি একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ষোলটি মহাজনপদের অস্তিত্ব যা ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র একটিতে। অর্থাৎ আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে এই একটি জনপদ তখন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর খণ্ডে, মৌর্যসাম্রাজ্যে পরিণত। অর্থনৈতিক বিবর্তন সাপেক্ষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ত্রিশটি ছোটবড় জনপদের ষোলটিতে পরিণত হ'তে দু'শ বছর যদি লেগে থাকে ও মহাভারত যুদ্ধের পরবর্তী দু'শ বছর ধরে মহাভারত রচিত হ'লে, রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। নৃতাত্ত্বিক বিচারে প্রত্নইতিহাস বিদ্‌রাও সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন। যাইহোক, রামায়ণ মহাভারতের রচনাকাল এখনও বিতর্কিত এবং সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্যে আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। অধ্যাপক সাংকলিয়ার প্রচেষ্টায় মহাকাব্যের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সন্ধানের কাজ সুরু হয়েছে বলে জানি। আশা করা যায়, প্রাপ্ত তথ্যাদি সিদ্ধান্তে পৌছিতে সহায়ক হবে।

গ্রন্থের লেখক 'মহাভারতের জন্মকথা' প্রসংগে (পৃঃ ৯ শেষ পঙ্‌ক্তি) বলেছেন 'জয় শব্দ উচ্চারণের পর পুরাণ-মহাভারতাদি পাঠ বিধেয়। জয় শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে যুদ্ধ জয়ের নয়—ধর্মের।' কিন্তু আমি যতটুকু জানি মহাভারতের আদি নাম ছিল 'জয়'। তাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ইতিহাস। (ইতি-হ-আস : এটি যেমন ছিল)। জয়নাম যুক্ত এই 'ইতিহাস' যুদ্ধ জয়েচ্ছু সকল ব্যক্তির শ্রোতব্য। 'ততো জয়মুদীরয়েৎ' যে বাক্যাংশটি নমস্ক্রিয়াসূচক শ্লোকে (পাদটীকা ৫ পৃঃ ১৬) আমরা পেয়েছি, সেটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সব জায়গায় পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ মনে করেন শ্লোকটি বৈষ্ণব প্রাধান্য কালে সংযোজিত হয়েছিল। তাই, মহাভারতের পুণা সংস্করণে শ্লোকটি সন্নিবেশিত হয়নি। পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট মহাভারত সম্পর্কে গবেষণার বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং তাঁদের তথ্য আমরা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করতে পারি। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য রামায়ণ নিয়ে বরোদার ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর একটি প্রসংগের উল্লেখ কোরে অবতরণিকাটি শেষ কোরব। গ্রন্থকার যুধিষ্ঠিরকে বিদুর পুত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতি ইরাবতী কার্ভে তাঁর Yuganta : The end of an epoch' গ্রন্থে এই অনুমানটি প্রথম উত্থাপন করেন। এসম্পর্কে তিনি কতকগুলি যুক্তিও দেখান যদিও যুক্তিগুলির প্রামাণিকতা দাবী করেননি এবং যমদেবকেই যুধিষ্ঠিরের পিতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। কবি প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু শ্রীমতি কার্ভের অনুমিতিটিকে মনোরম আখ্যা দিয়ে যুধিষ্ঠির যে বিদুরপুত্র হতে পারেন না তার সপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা আপাত গ্রাহ্য বলে মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বিদুরপুত্র হিসাবে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিষ্ঠিত করার সপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকে যায়।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। জন্মবৃত্তান্ত আলোচনায় বিভিন্ন জায়গায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণী বৈষম্য প্রাসংগিকভাবে এসেছে। আমার মনে হয়, লেখক যদি মহাভারতের কাল ও সমাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হ'লেও একটি বস্তুবাদী বিশ্লেষণ আলাদা অধ্যায়ে উপস্থিত করতেন তা' হলে 'মহাভারতের জন্মকথা' বৃত্তান্তগুলি আলোচনার দৃষ্টিভংগীগত একটা নির্দিশ আমরা পেতাম ও তা গ্রন্থটিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজনে সহায়ক হোত।

আগের কথার জের টেনে আবার বলি যে গ্রন্থকার শ্রীমধু চট্টোপাধ্যায়ের সংগে আমার যে সম্পর্ক তাতে তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, এই উপস্থাপনাটিকে আমার বন্ধুকৃত্য বলে গ্রহণ করলে আনন্দিত হব। গ্রন্থটি সমাদৃত হলে মহাভারতের একটি দিক থেকে আমাদের চিন্তা ও চেতনা সমৃদ্ধ হবে—যুক্তিহীন আনুগত্যের পরিবর্তে মহাভারত সম্পর্কে জাগবে আমাদের মননশীল শ্রদ্ধা এই আশা পোষণ করছি।

একটি পাণ্ডুলিপির জন্মকথা

গ্রহান্তরের উন্নত মানুষ বা স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যে এসে সভ্য মানুষের জন্ম দিয়ে আবার ফিরে গেছেন স্বর্গবাসে—এরিক ফন্ দানিকেণের এই তত্ত্ব বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মতে অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মানুষের বড় হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। বাস্তবতার দিক থেকে সে ইতিহাস একান্তই জীবন ও শ্রেণী সংগ্রামের। পৃথিবীর সব মহাকাব্যেই এই ইতিহাস বিধৃত। ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয় রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে শ্রেণীস্বার্থের কারণে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সুকৌশলে। বলা বাহুল্য যে, কাব্য-সাহিত্য-পুরাণকথা সমাজের অভিজাত মানুষেরই সৃষ্টি। আদর্শবাদের নামে, ধর্মকথার আবরণে অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে তাতে। গণ-আন্দোলনের যুগে শ্রেণী স্বার্থের পাণ্ডারা দানিকেনের মারফতে পুরানো তত্ত্ব নতুন করে দেখাবার চেষ্ট করছেন আবার।

‘দানিকেনের বিভ্রান্তি’ নামক একটা তথ্যমূলক গ্রন্থ পড়তে পড়তে আমার মনে পড়েছে প্রাচীন সমাজেতিহাসের আকর গ্রন্থ মহাভারতের কথা। উক্ত কাব্যের আদিপর্বের দু’একটি জন্মকথা নিয়ে লিখতে থাকি দু’একটি প্রবন্ধ। এবং তা দেখাতে দিই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের। তাঁরা খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং আরও লিখবার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর আমি অল্পদিনের মধ্যেই “মহাভারতে জন্মকথা” নাম দিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করি। তখন বন্ধুবর আরতি কুমার বসু, ভক্তি ঠাকুর’ মৃণাল কান্তি ঘোষ এবং কবি-শিল্পী বাদল ভট্টাচার্য প্রবন্ধগুলি পাঠ করে অবিলম্বে পাণ্ডুলিপিটি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য আমাকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশের একটা মস্ত সমস্যা রয়েছে এই লেখকের। বই ছাপালেও প্রচারের দায়-দায়িত্ব বহন করা আমার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় ভেবে চুপ করে যাই।

ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে স্বগত সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয়বর্ষ বই মেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে—লাল ময়দানে। কলকাতার বেশ কিছু নামী-দামী পুস্তক প্রকাশন সংস্থা যোগ দেন সেই মেলায়। তখনই প্রকাশক শ্রীশ্যামল ঘোষের সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ ঘটে।

পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা বাদের সূত্রে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কথায় কথায় বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির কথা জানাই তাঁকে। তিনি আমাকে পুস্তক প্রকাশের আশ্বাস দেন এবং মাস দুই পরে যোগাযোগের কথা বলেন। কেননা তিনি তখন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় বই মেলা নিয়ে ব্যস্ত। পুস্তক প্রকাশের বিলম্ব ঘটতে থাকায় আমার অন্তরঙ্গরা তাগিদ দিয়ে চলেন নিয়মিত। পরিশেষে পাণ্ডুলিপি পাঠাবার কাজ পাকা হয় কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতায় গিয়ে মুদ্রণের কাজ তদারকি বাধা হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত প্রকাশনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব প্রকাশক শ্যামল ঘোষের কাঁধে চাপিয়ে দেই এবং তিনি তা সানন্দে বহন করেন। যদিও এ বিষয়ে আমার খুঁত খুতানি মনোভাব প্রবল। কেননা, দীর্ঘদিন 'স্বগত' পত্রিকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে নিজের চোখে সব কিছুই দেখাই ছিল আমার বরাবরের অভ্যাস। শরীর আমার সব কিছুতেই বাদ সেধেছে আজ।

গ্রন্থের ভূমিকার বদলে 'উপস্থাপনা' করেছেন বন্ধুবর মৃণাল কান্তি ঘোষ। তিনি তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন এতে। তিনি ছাড়া আরও অনেকেরই অবদান ও আন্তরিক শুভেচ্ছা রয়েছে এই পুস্তক প্রকাশের পেছনে। তাঁদের কাউকেই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইনে। তাহলেও নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ জানাতে হয়। এরা সকলেই আমার আপনার জন। আপনার জনের সঙ্গে লোক দেখানো ভদ্রতার কোনো মানেই হয় না। আমি এর ঘোরতর বিরোধী।

এতকথা বলার পরেও একটি কথাই বলার আছে যে, পুস্তকের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য লেখকই দায়ী—আর কেউ নয়। এখন পাঠকরা খুশী হলে আমার শ্রম সার্থক।

বিনীত—

মধু চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুর-

১৩/৩০, হর্ষবর্ধন রোড

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১। তোমার পৃথিবী তবু গ্যালিলিও (কাব্যগ্রন্থ)

২। দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)

৩। ইস্পাতের মানুষ

।। মহাভারতের জন্মকথা ।।

পৃথিবীর আদি এবং ধ্রুপদী মহাকাব্য চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাভারত অন্যতম। মহর্ষি ব্যাস বিরচিত এই মহাকাব্য বস্তুত এক সংহিতা অর্থাৎ সংকলন গ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থরূপে একে বলা হযেছে পঞ্চম বেদ। আসলে যে সকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাই সংগ্রহ করে সংকলিত হয়েছে এই মহাভারত গ্রন্থে। এই গ্রন্থ একাধারে ধর্মশাস্ত্র কামশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস এবং কাব্য।[১] যদিচ কাব্যাপেক্ষা মহাভারত ইতিহাস হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে 'ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।'

প্রবাদ আছে, 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।' অর্থাৎ এই গ্রন্থে যা আছে তা অন্য গ্রন্থে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু মহাভারতে যা নেই তা অন্যত্র কোথাও নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপম গ্রন্থ এই ভারত কথা। ভারতবর্ষের চিরকালের চিত্তসম্পদ বিধৃত আছে এই মহাগ্রন্থে। বিষয়বস্তুর গৌরবে ভাবের গাম্ভীর্যে এবং আকৃতির বিরাটত্বে গ্রন্থ এই গ্রন্থ পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাগ্রন্থ নিঃসন্দেহে। ধারে-ভারে-বিশালতায় এই গ্রন্থ সেকালের অন্য গ্রন্থাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও মহত্ব লাভ করায় বলা হয়েছে 'মহাভারত'।[২] কথিত আছে, পুরাকালে দেবগণ মিলিত হয়ে তুলাদণ্ডের একদিকে সরহস্য সমগ্র বেদ ও অপরদিকে মহাভারত চাপিয়ে দিয়ে ওজন করে দেখেছিলেন তাঁরা। তাতে এই গ্রন্থখানির মহত্ব এবং ভারবত্ব বেশি হওয়ায় মহাভারত নামে খ্যাত হয়েছে সেকালে। অধিকন্তু ভরতবংশীয় রাজাদের বৃত্তান্ত ও মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে এতে। যে কারণে একে বলা হয়েছে 'ভারত'। ব্যাসদেব স্বয়ং এই গ্রন্থকে হিমালয় ও সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, অনন্ত রত্নপ্রভব হিমালয়ের ন্যায় মহাভারতও অতি তুঙ্গ ও বিরাটকায় এবং সুগম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় এ অতলস্পর্শী ও অসংখ্য রত্নের আকর।[৩]

মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বর্ণনা নয় আদপে। ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় এই গ্রন্থের সারসত্য।[৪] মহাভারত পাঠের নিয়ম প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে যে, নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে 'জয়' শব্দ উচ্চারণের পর পুরাণ-মহাভারতাদি পাঠ বিধেয়।[৫] 'জয়'

শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে যুদ্ধ জয়ের নয়—ধর্মের। অধর্মের পথে আপাততঃ জয়লাভ সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয়ে থাকে ধর্মেরই। কিন্তু ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। মহাজ্ঞানী ভীষ্মের মুখে এই উক্তি শ্রবণে ধর্মের গতি সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে আমাদের। সত্যিই তো ধর্মের স্বরূপ কি?

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্মের ঠাঁই ছিল সামাজিক অবস্থানের উপর নিতান্তই নির্ভরশীল। নানা জাতি নানা বর্ণ-বৃত্তি এমনকি নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্যই যেন ছিল পৃথক পৃথক ধর্ম। আধুনিক কালের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে—নৈতিকতা। ব্রাহ্মণের জন্য যেমন ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, রাজার জন্য ছিল তেমনি রাজধর্ম, এমনিভাবে বীরের জন্য বীরধর্ম, নারীর জন্য নারীধর্ম, গৃহস্থের জন্য গার্হস্থ্যধর্ম, সতীর জন্য সতীধর্ম, গণিকার জন্য গণিকাধর্ম· চোরের জন্য চৌর্যধর্ম ইত্যাদি ছিল ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারার আদর্শগত বৈশিষ্ট্য। তবে সর্বোপরি ছিল এক পরমধর্ম। মহাভারত কাহিনীর মূল সূত্ররূপে আমরা তাই দেখতে পাই ক্ষাত্রধর্মের সঙ্গে পরমধর্মের চরম সংঘাত। আমরা এও দেখতে পাই যে, এই পরমধর্মের নামে পাণ্ডবদের দিয়ে পদে পদে লঙ্ঘন করানো হয়েছে ক্ষাত্রধর্মকে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে বর্ণগত ধর্মের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা প্রকৃতই প্রণিধানযোগ্য। উদ্যোগপর্বের এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন যুধিষ্ঠির—"এইরূপ জগতে বিভিন্ন বর্ণসমূহের যে সকল নিজ নিজ লক্ষণ আছে, এই সকল লক্ষণ যেমন সেই সেই বর্ণের পক্ষে ধর্মস্বরূপ সেইরূপ আবার এই সকল লক্ষণ অন্য বর্ণের পক্ষে অধর্মস্বরূপ হয়।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান-যজ্ঞ ও তীর্থ পর্যটন ছিল বর্ণগত ধর্ম, তেমনি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছিল শৌর্যাদি প্রদর্শন, বৈশ্যের পক্ষে কৃষি কার্যাদি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শূদ্রের পক্ষে ভদ্রের সেবাধর্ম ছিল নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্ট ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়াই ছিল অধর্ম।

যে-ধর্ম ধর্মান্তর বিরোধী তা কথনই ধর্ম পদবাচ্য নয়। পরস্পর অবিরোধী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা এড়ানো এক কঠিন কর্ম ছিল মহাভারতের যুগেও। যে-কারণে কৌরবের প্রকাশ্য রাজসভায় রজঃস্বলা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে মহাভারতের ধর্ম সম্পর্কিত সর্বপ্রধান প্রবক্তা পিতামহ ভীষ্ম ও দুঃশাসন-দুর্যোধনাদির ওই হীনকাজকে নিন্দা করবার যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—"ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম।" দ্রৌপদীর প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারেননি তিনি।

কাব্য-ইতিহাসাপেক্ষা ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মহাভারত আজও সাধারণের কাছে সুপরিচিত এবং স্বীকৃত। ধর্মই মহাভারতের মর্মকথা। এই ধর্ম লাভের উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন, 'বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ধর্মানুষ্ঠান করাই মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।' এতো পুরোদস্তুর শ্রেণীস্বার্থের কথা! ধর্মের নামে পুরোহিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে গিয়েছেন তিনি। বৈদিক সাহিত্যে শ্রেণীসংগ্রামের উল্লেখ আছে অনেকস্থলেই কিন্তু বৈদিক যুগের শেষে ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সমঝোতার ফলে উদ্ভব হয়েছিল নব্য পুরোহিত শ্রেণীর এবং অবসান হয়েছিল শ্রেণী সংগ্রামের। এই নব্যপুরোহিত তন্ত্রের বিশিষ্ট পুরোহিত ছিলেন 'বশিষ্ঠ'।[৬] 'বশিষ্ঠ' ব্যাসদেবের প্রপিতামহ। সমগ্র মহাভারত মহাকাব্যের তাৎপর্য অনুধাবনে মহর্ষি ব্যাস বিরচিত 'ভারত-সাবিত্রী'র চারটি শ্লোক সবিশেষ উল্লেখ্য। এই চারটি শ্লোকের মধ্যে মহাভারতের তাবৎ কথাই সূক্ষ্মভাবে নিহিত। মহর্ষি বলেছেন, "জন্ম-জন্মান্তরে সহস্র সহস্র পিতা-মাতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটেছে। তাঁরা সকলেই গত হয়েছেন, অন্যেরাও গত হবেন। জীবনে অসংখ্য আনন্দ এবং ভয়ের কারণ ঘটে। মূঢ়ব্যক্তিগণকেই সেই আনন্দ-ভয় অভিভূত করে থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে তা অভিভূত করতে পারে না। ধর্মপথে থেকেই অর্থ এবং কাম উপভোগ করা যায়। কেন লোকে ধর্মের সেবা করে না—এই কথা আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিতেছে না।"[৭]

মানব-চরিত্রের বিচিত্র চিত্রশালা এই মহাভারত কথা। সে-যুগের সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-চরিত্রের আচার-আচরণের অনেক বিচ্যুতি চোখে পড়ে আমাদের। এসব বিচিত্র চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমন্বয়সাধন সম্ভবপর নয় কখনই। কেননা রূপক ও রূপকথার আড়ালে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে জটিল ও রহস্যময়। তথাপি সে-যুগের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার সাথে এ-যুগের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতি-দোষ-গুণের পার্থক্য নেই বিশেষ। পার্থক্য নেই সে-যুগের মানুষের শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে এ-যুগের মানুষের শ্রেণী-সংগ্রামের। যুগ-যুগান্তকাল ধরে চলে আসছে মানুষের শ্রেণী-সংগ্রাম। যতদিন শ্রেণী থাকবে ততদিন থাকবে শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বান্দ্বিক নিয়মে। মানব-জাতির সভ্যতার ইতিহাসই তো শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। পৃথিবীর তাবৎ মানব-সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত

শ্রেণী সংঘর্ষের অবসান ঘটবে না কোনদিনও। যাঁরা ভারতীয় পুরাণ মহাকাব্যে শ্রেণী-সংগ্রাম নেই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন সচরাচর কিংবা যাঁদের ধারণা ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের সমাধান করেছে, 'বর্ণাশ্রম' বিন্যাস তাঁদের অবগতির জন্য এটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট যে, সে-কালের শ্রেণী-সংগ্রাম ধর্ম-সংঘর্ষেরই রূপ ধারণ করেছিল ভূ-ভারতের সর্বত্রই। অতএব ভারত তার ব্যতিক্রম নয় কখনও। তথাপি কেউ যদি অস্বীকার করেন এই সত্যকে তবে তাঁকে অন্তত একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে—মহাভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পেছনে ধর্মের নামে শ্রেণী-সংগ্রামকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে শ্রেণীসহযোগিতা লাভের চেষ্টা হয়নি কি?

বৈদিক যুগের পরবর্তী এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী সময়ের সমাজ-ব্যবস্থার কথা রয়েছে আপস্তম্বীয় শ্রৌতসূত্রে, গৌতম ও বৌধায়নের স্মৃতি-শাস্ত্রে। বুদ্ধের সময়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল করেছেন জার্মান পণ্ডিত ফিক সাহেব। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যাপারে পুরোহিত শ্রেণীর কোনোপ্রকার কর্তৃত্বের নজীর পালিসাহিত্যে নেই। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে এবং সম্রাট অশোকের শাসনাদর্শে ভারতে একজাতীয়তা আনবার চেষ্টা হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজার অধীনে। ইতিপূর্বে হিন্দুরা কখনও ধর্মরাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেনি বাস্তবে। যদিও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রাজনীতি-বিজ্ঞানের খাঁটি ধর্মতন্ত্র (Theocracy) অনুযায়ী সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায়। এ যেন মধ্যযুগীয় ইউরোপের Holy Roman Empire সংস্থাপনের সঙ্গে সৌসাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুরাণ মহাকাব্যের মধ্যে বহুলাংশে বিধৃত। সংস্কৃতে ইতিহাসের নাম বলা যেতে পারে পুরাণ। এই ইতিহাসের তাৎপর্য ছিল জনশ্রুতি বা ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক কালের ইতিহাস যেমন গড়ে ওঠে History from below তেমনটি না হয়ে সেই ইতিহাস ছিল রাজ-রাজড়া আর মুনি-ঋষিদের বংশগত জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান। তথাপি আজকালকার পণ্ডিতদের মতে পুরাণসমূহে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে সন্দেহাতীতভাবে রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য দুটিতেও ইতিহাসের উপাদান প্রচুর। তবে সে ইতিহাস নিঃসন্দেহে শ্রেণী-সংগ্রামের। রামায়ণে ব্রাহ্মণ-

ক্ষত্রিয়ের ভীষণ যুদ্ধ বর্ণিত আছে এবং নায়ক রামচন্দ্র কর্তৃক ঘটানো হয়েছে তার পরিসমাপ্তি। মৎস্য ও বায়ুপুরাণ অনুযায়ী মহাভারতে পৌরব রাজা জন্মেজয়ের সঙ্গে ঋষি বৈশম্পায়ণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল ধর্মযুদ্ধ। যজ্ঞে গো-হত্যার প্রয়োজন আছে কী নেই তাই নিয়ে বাজসনের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঘটেছিল রাজা জন্মেজয়ের ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক। জন্মেজয় ছিলেন পশুহত্যার বিরোধী। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, এই বিবাদে ব্রাহ্মণদের বিপক্ষে কৃতকার্য হয়েছিলেন রাজা।

বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সমাজ যতই ঐতিহাসিক যুগের দিকে এগিয়ে এসেছে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রেণী-সংগ্রাম। কেননা সমাজে ততদিনে আইনের অধিকার কিংবা অর্থনীতির অধিকার নিয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল শ্রেণীসমূহের ব্যবধান। বৈদিক যুগের সরল অনাড়ম্বর দিন যাপনের জীবন শেষ হয়ে গিয়ে উদ্ভূত হয়েছিল শ্রেণীভেদ প্রথা। স্থাপিত হয়েছিল পেশাগত সংঘসমূহ। সংগঠিত হয়েছিল জনপদ বিশেষে সাধারণতন্ত্র। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৌমগত রাজার অধীন রাষ্ট্র ভেঙ্গে রাজতন্ত্রবিহীন অভিজাততন্ত্র। অন্যদিকে দেখা দিয়েছিল রাজাধীন বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ। এইসব বিবর্তন নিশ্চিতই ছিল একটা অর্থনৈতিক বিবর্তন সাপেক্ষ। ধর্মজগতে তখনও সৃষ্টি হয়নি দেবকুলের শ্রেণী-বৈষম্য, উদ্ভব হয়নি পৌরাণিক দেব-দেবীর। ইন্দ্র-বরুণ কিছু কিছু দেবতা নিতান্তই কৌমগত না থেকে পরিণত হয়েছে সাধারণ দেবতায়। ভারতেতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণের লক্ষণসমূহ পরিস্ফুটিত হতে থাকে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং ধর্মে। এই যুগসন্ধিক্ষণেই ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন শাক্যসিংহ অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধ। ধর্ম-জগতে ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী মত প্রচার করেন ইনি। ফলে ধর্মরাজ্যে ঘটে গিয়েছিল এক মহাবিপ্লব। ম্যাক্সমূলারের মতে, 'প্রচলিত বর্ণাশ্রম পদ্ধতি অনুযায়ী বা ব্রাহ্মণ্যবাদসম্মত যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বুদ্ধ তাহাতে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মপদ্ধতি সাম্যবাদী ও আন্তর্জাতিক ছিল; ইহা সর্ব বিষয়েই ব্রাহ্মণদের ধর্মমত-বিরোধী ছিল'।[৯] বাস্তবিকপক্ষে, বৌদ্ধরাই ভারতে প্রথম গণতান্ত্রিক সমাজ-চেতনা ও রাষ্ট্র-বোধ-বিপ্লবের উদ্গাতা। বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্য ধ্বংস করে সর্বমানবিক ঐক্য স্থাপনই ছিল বুদ্ধের সাম্যবাদী ধর্মপ্রচারের প্রধান লক্ষ্য। বহুধা বিক্ষিপ্ত জন-অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে সংহত করে আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন বুদ্ধ। চরক-সুশ্রুত-নাগার্জুন-ভাস্করাচার্য-বাৎস্যায়ন-কৌটিল্য-পাণিনি প্রমুখ বহু মহাজন

ব্যক্তি ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন। ভারত ইতিহাসে বুদ্ধই ছিলেন মানবের প্রথম মুক্তিদাতা, প্রথম বিপ্লবী এবং প্রথম জনগণমন অধিনায়ক। তথাপি এই ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ বিবাদে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ও তার সহিংস আক্রমণে ভারত ছাড়া হয়েছিল দশম শতাব্দীর মধ্যেই।

হিন্দুর সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবত সাহিত্যাপেক্ষা বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে বরাবর। বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ্‌রাই এইসব ধর্মগ্রন্থকে সাহিত্য হিসাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করেন প্রথম এবং প্রশ্ন তোলেন ঐতিহাসিক কাঠামোর অস্তিত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে। অবশ্য বিদেশী পণ্ডিতদের অনুগামী হয়েছেন ভারতীয় পণ্ডিত প্রবররা। নানা প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণের পর 'প্রত্ন-ইতিহাসবিদ্‌রা' সিদ্ধান্তে আসেন যে, উত্তর-ভারতে উপনিবিষ্ট বৈদিক আর্যদের দক্ষিণাভিমুখীন অভিযান ও আর্যেতর জাতিগোষ্ঠীর যুদ্ধাবলী বর্ণিত হয়েছে রামায়ণে আর উত্তরাপথে অধিষ্ঠিত আর্যদের স্বগৃহ-বিরোধ ও বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে মহাভারতে।[১০] কিন্তু কবে আর্যরা ভারতে এসেছিলেন এবং উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তার কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই ঐতিহাসিকদের হাতে। "ভারতবর্ষে দুবার দুটি বিভিন্ন দলে এবং বিভিন্ন সময়ে আর্যরা এসেছিলেন। এর একদল বাস করেছেন উত্তর প্রদেশে এবং পুর্ব-পাঞ্জাবের কিয়দংশে এবং আর একদল এদের ঘিরে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বিহার এবং বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করেছেন। এই দুই দল আর্যদের মধ্যে বরাবরই একটা রেষারেষির ভাব দেখা যায়।"[১১]

ভারতে আর্যাধিকার প্রতিষ্ঠার অনেক পরেই লিখিত হয়েছিল রামায়ণ মহাভারত নামক মহাকাব্যদ্বয়। আর্যদের আগমনের কত পরে লিখিত হয়েছিল তা একান্তই অনুমানসাপেক্ষ ব্যাপার। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারানুযায়ী এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে খ্রীষ্টপুর্ব ১৭শ' থেকে ১৫শ' অব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও এক সময়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন বৈদিক ভাষাভাষী আর্যগণ। "ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা আর্যদের সঙ্গে দাস-দস্যুদের যে যুদ্ধের বর্ণনা পাই তাতে দেখি যে এইসব দস্যুরা 'পুর' দখল করে আছেন এবং এগুলি বৃহৎ অট্টালিকা এবং দুর্গসমন্বিত। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে আর্যরা ভারতবর্ষে এসে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার

অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাঁদের নির্মূল করে এই সিন্ধু উপত্যকা দখল করেন। ঋগ্বেদের বর্ণনায় আমরা দেখি যে এ যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি, যদিও পঞ্চনদ দেশ বা সপ্তসিন্ধু দেশ আর্যদের কবলিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অন্যদিকে মোহেঞ্জোদড়ো ধ্বংসের সময় ১৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে মনে করেন।"[১২] এই মনে করার পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত কার্বণ পরীক্ষা।

আর্যদের আগমনের অন্তত চার-পাঁচশো বছরের মধ্যে ঘটেছিল তাঁদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান। রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার কাল তাই দাঁড়ায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়। তারও দু'শ কি তিনশ' বছর বাদে যদি ঘটে থাকে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ তাহলে সময়টা দাঁড়ায় খ্রীষ্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতাব্দী। অবশ্য "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ আছে। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মতে খ্রী. পূ. ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি এই যুদ্ধ হয়েছিল। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে যুদ্ধকাল খ্রী-পূ ২৪৪৯। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে খ্রী-পূ ১৫৩০ বা ১৪৩০। বালগঙ্গাধর তিলক, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে প্রায় খ্রী-পূ ১৪০০। এফ. ই. পার্জিটার, অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং এল. ডি. বার্ণেটের মতে খ্রী-পূ দশম শতাব্দ। ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন আদি মহাভারত গ্রন্থ খ্রী-পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছে। বর্তমান মহাভারতের সমস্ত এককালে রচিত না হলেও এবং তাতে বহুলোকের হাত থাকলেও সমগ্র রচনা এখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে চলে।"[১৩]

পূর্ব সূত্রানুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব নবম-অষ্টম শতাব্দীতে সংঘটিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দু'শ-তিনশ বছর পরেও যদি রচিত হয়ে থাকে মহাভারত তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেকার কোন সময় অনুমান করা চলে সহজেই। কিন্তু মহাভারত বিষয়ক অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত ই. ডব্লিউ হপ্‌কিন্স সাহেবের মতে গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতাব্দের মধ্যে "অর্থাৎ প্রায় সাতশ বছর ধরে মহাভারতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মাল-মশলা সন্নিবেশিত হয়েছে। মহাভারত পাঠ করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মৌর্যোত্তর যুগের বহু মাল-মশলা এর মধ্যে সন্নিবেশিত। মধ্য-এশিয়ার যে-সব প্রথা ভারতে প্রবেশ করেছে তারই একটি নিদর্শন হল দ্বিতীয় পাণ্ডব কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান।"[১৪] "এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, খাঁটি মহাভারত যেটুকু

তার খুবই পুরান, খ্রীঃ পূঃ ৯ম-৮ম বা তার কাছাকাছি সময়ের, আর পরবর্তী অংশগুলো মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালের অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩য় থেকে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দের মধ্যে। ভগবদ্‌গীতার সংযোজন নিঃসন্দেহেই আরো পরের ব্যাপার এবং তা বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্তি ও হিন্দু পুনরভ্যুত্থান কালের রচনা।"[১৫] মোটের ওপর প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চলেছে মহাভারতের গঠন পর্ব। অনুরূপ মত প্রকাশ করে একালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডি. ডি কোশাম্বী বলেছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বর্তমান কলেবরে রচিত হয়েছিল মহাভারত এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তার বৃদ্ধি ছিল অব্যাহত।[১৬] যাই হোক এ কথা অবিসংবাদিত যে প্রাচীন ও মধ্য-যুগের বহু বিচিত্র সমাজ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মহাভারতে। তাতে যেমন আছে চরম মহত্ত্ব ও পরম মনুষ্যত্বের অসংখ্য দৃষ্টান্ত, তেমনি আছে অনন্ত অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার কাপট্য লাম্পট্য ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত। সত্যিই মহাভারতের কথা অমৃত সমান, যার তুলনা নেই ভূ-ভারতের অন্য কোন মহাকাব্যে।

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১. অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনমিত বুদ্ধিনা॥ —আদি, ২/৩৮৩
[পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহাভারত]

২. পুরাকিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলনা ধৃতম্।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা॥
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মানং যতোঽধিকম্॥
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বা চ মহাভারতমুচ্যতে॥ —আদি ১/২৭২-২৭৩
[পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহাভারত]

৩. যথা সমুদ্রেণ ভগবান্ যথা হিমবান্ গিরিঃ।
খ্যাতাবুভৌ রত্ননিধি তথা ভারতমুচ্যতে॥ —স্বর্গারোহণ পর্ব, ৫/৬৬
[পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহাভারত]

৪. যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। মহাভারতের নানা পর্বে ব্যবহৃত হয়েছে শ্লোকটি। যেমন, উদ্যোগ পর্বে, ৩৯/৯, ১৩৮/১৬; ভীষ্মপর্বে—২১/১১, শল্যপর্বে—৬৩/৬০, স্ত্রীপর্বে—১৪/৯, ১২, ১৮/৬ ইত্যাদি।

৫. নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

৬. "তাহারা [পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্তুতি-গায়করা] তাহাদের কবি-প্রতিভাকে ধর্মের কাজে লাগাইয়া রাজা ও ধনীর প্রাণের ইচ্ছা দেবতাদের নিকট নিবেদন করিত। এজন্য তাহারা মোটা রকমের পারিশ্রমিক ও বক্শিস্ পাইত। এভাবে তাহাদের খ্যাতি ও পদোন্নতি হইত এবং বিশেষভাবে দেবতাদের দ্বারা অনুগৃহীত বলিয়াও বিবেচিত হইত। বৈদিক-যুগের শেষে এই প্রথা হইয়াছিল যে, পূজা সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য, সমস্ত কৌমের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল এবং যাহা রাজা সম্পাদন করিতেন তাহা তিনি স্বয়ং না করিয়া একজন স্তুতিগায়কের উপর উহার কার্যভার ন্যস্ত করিতেন। এরূপ ভারপ্রাপ্ত একজনকে বলা হইত, 'পুরোহিত' (পুরত্রাতা—ঋকবেদ, ৭,৩৩,৬); রাজা সুদাস ও তাঁহার কৌম ত্রৎসুর এরূপ একজন পুরোহিত ছিলেন 'বশিষ্ঠ' (৭,৮৩,৪)। এখানেই ভারতীয় পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভবের আরম্ভ।"

—ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি / ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১ম খণ্ড সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭

৭ মাতা-পিতৃ সহস্রাণি পুত্রদার শতানি চ।

সংসারেষ্বনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপরে॥ —উদ্‌যোগ পর্ব, ৪০/১৬

হর্ষস্থান সহস্রাণি ভয়স্থান শতানি চ।

দিবসে দিবসে মূঢ়মা বিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥

উর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্।

ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥ —স্বর্গারোহণ পর্ব, ৫/৬১-৬২

৮. Fick: The Social Organization in North East India in Buddha's Time গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৯. ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত / পৃঃ ১৭৫ সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭

১০. বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত / পৃঃ ২৫

১১. ধর্ম ও কুসংস্কার—ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় / পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১

১২. ধর্ম ও কুসংস্কার—ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় / পৃঃ ১২৩-১২৪

১৩. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ গ্রন্থে রাজশেখর বসুর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ষষ্ঠ মুদ্রণ—১৩৭৮। কোনপ্রকার নিজস্ব মত প্রকাশ করেননি বসু মহাশয়। পণ্ডিতদের বিতর্কিত মতই প্রকাশ করেছেন শুধু।

১৪. ধর্ম ও কুসংস্কার / সুধাকর চট্টোপাধ্যায় / পৃঃ ১২

১৫. বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা / নন্দগোপাল সেনগুপ্ত / পৃঃ ২৬-২৭

১৬. **"The brahmin redaction, which is all that now remains, took its present form between 200 B. C. and A. D. 200 as a Collection of over 80,000 Verses, with a few prose passages...The Process of Mahabharata inflation did not end by any means in A. D. 200, but continued down to the nineteenth century"—The culture & civilisation of Ancient India (The Epic Period) page—92-93 by D. D. Kosambi.**

১ঃ ॥ মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি ॥

মানুষের জন্মবৃত্তান্ত আজও রহস্যময়। যদিচ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে বৈজ্ঞানিকপন্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং অযৌন কোষ থেকে যৌন কোষ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তথাপি সৃষ্টির রহস্যময়তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। কাজেই মহাভারতের যুগে অর্থাৎ বাস্তব কালগণনায় দেড়-দু'হাজার বছর আগেকার মানুষের কাছে জন্মরহস্য যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মহাভারতের আদত ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে রাজা উপরিচর বসু থেকে। পুণ্যজনক লক্ষশ্লোকের উদ্গাতা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ছিলেন এর রচয়িতা। তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে "কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্বৃত্ততা"[১] অবিকল বর্ণনা করেছিলেন তিনি। ভারত যুদ্ধ কথা আরম্ভের পূর্বে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির আদি পর্ব। বস্তুত ভারত সংহিতা চব্বিশ হাজার শ্লোকে রচিত হয় প্রথম। তাতে সমুদয় উপাখ্যানভাগ বর্জিত হয়েছিল তৎকালে। পরে সার্দ্ধশতশ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করেন মহর্ষি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূবাদিত মহাভারতের একষট্টিতম অধ্যায় থেকে ভারতকথা শুরু। তেষট্টিতম অধ্যায়ে গিয়ে প্রাগুক্ত উপরিচর বসুর পরিচয় মেলে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের 'মহাভারতম্' গ্রন্থের আটান্নতম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে উপরিচর বসুর পরিচয়।[২] কথারম্ভ হয়েছে এভাবেই: "পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরমধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম বসু। তিনি সর্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন।"[৩] এই চেদিরাজ্যের অবস্থান ছিল যমুনার দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডের পূর্বাংশে নর্মদার উত্তরে।

একদা রাজা উপরিচর বসু তদীয় পত্নী ঋতুস্নাতা গিরিকাকে ছেড়ে পিতৃ-পুরুষগণের আদেশে মৃগয়ায় গেলেন আকস্মিকভাবে। তখন বসন্তকাল।

কুবেরের উদ্যানসম এক মনোহর কুসুমকাননে অতঃপর প্রবেশ করলেন তিনি। রমণীয় সেই বসন্তে বনভূমি কোকিলালাপে মুখরিত; ফুল মধুপানে মত্ত ভ্রমরাদি পুলকে গুঞ্জরিত। তথাপি গিরিকা বিরহে রাজার মন তখন মদন বাণে জর্জরিত। মৃগয়ায় ভ্রমণরত রাজা অবশেষে বিকশিত এক অশোকতরুমূলে উপবেশনপূর্বক বসন্ত বায়ু সেবন সুখে কামোদ্দীপ্ত হলেন এবং শুক্রপাত ঘটে গেল অচিরে। ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত রাজা সেই শুক্র যাতে বিফলে না যায় এবং রাজমহিষীর ঋতুও যাতে ব্যর্থ না হয় এরূপ বিবেচনা করে মন্ত্রোচারণ দ্বারা বীজ শোধনান্তে দ্রুতগামী এক শ্যেনপক্ষীকে বললেন—"হে সৌম্য! অদ্য আমার মহিষীর ঋতুকাল, অতএব তুমি অতি সত্বর আমার এই রেতঃ লইয়া তাহাকে প্রদান কর।" [৪]

বেগবান শ্যেনপক্ষী স্খলিত সেই শুক্র মুখে ছুটে চলল আকাশ পথে। অপর এক শ্যেনপক্ষী ঐ দ্রুতগামী শ্যেনের চঞ্চুস্থিত শুক্রকে 'মাংসখণ্ড' মনে করে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিতে শুরু করল তুণ্ডযুদ্ধ। যুদ্ধকালে তুণ্ডচ্যুত সেই শুক্র গিয়ে পড়ল যমুনার জলে। সেখানে আবার বাস করত ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপী কোন এক অপ্সরা। এই অপ্সরার নাম অদ্রিকা। অদ্রিকা শ্যেনপক্ষীর চঞ্চুভ্রষ্ট-সেই বীজ ভক্ষণ করে গর্ভবতী হল অতঃপর। দশম মাসেই জেলেদের জালে ধরা পড়ল মৎস্যরূপা অপ্সরা। তার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হল এক পুত্র ও এক কন্যা। জেলেরা তাদের নিয়ে উপস্থিত হল রাজসমীপে। রাজা উপরিচর বসু গ্রহণ করলেন পুত্রকে আর রাজার আদেশক্রমে পুত্রী হল মৎস্যজীবীর কন্যা। এই কন্যার নাম মৎস্যগন্ধা। পরে পরাশর মুনির বরে মৎস্যগন্ধা হলেন গন্ধবতী বা যোজনগন্ধা। বস্তুতঃ ইনিই হলেন মহাভারতকার ব্যাসদেব জননী সত্যবতী।

মহাভারতের এই কাহিনী থেকে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, সেই যুগে মানুষের জন্ম সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার প্রকৃতই এত অভাব ছিল কিনা অথবা আসল ঘটনা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই রূপকথার অবতারণা?

প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে, প্রাচীনযুগে মানুষের জন্ম সম্বন্ধে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার অবকাশ ছিল না। বহু গবেষণার পর মানববিকাশের বিবর্তন ধারার যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, একই শাখা থেকে উদ্ভব হয়ে থাকলেও দুটি প্রজাতির মধ্যে কালের ব্যবধানে ঘটে গেছে বিরাট পার্থক্য। উভয় প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যার

মধ্যে আর মিল নেই। মাছতো কোন্ ছার, নরাকার পশু আর অত্যুন্নত মানুষের মধ্যেও ক্রোমসোমের সংখ্যার অমিল ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। এমনটি একবার ঘটে গেলে খোদ্ দেবতারাও যদি মানবাকৃতি রমণীর সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রমণে লিপ্ত হন তথাপি কোনও প্রজাতি গঠনে সক্ষম হবেন না আদপে। এক্ষেত্রে মানুষের ক্রোমসোম আর মাছের ক্রোমোসোম এক নয় কখনই।[৫] তাহলেত মাছেরা মানুষ হয়ে যেত এতদিনে। নিপাত হয়ে যেত বর্তমানকালের মাছের বংশধারা।

মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি বিষয়ে বিপত্তির কারণ ঘটেছে নানাভাবে। অবশ্যই রাজা উপরিচর বসুর শুক্রস্খলন কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয় এক্ষেত্রে। তখনকার দিনে মহাভারতীয় পুরুষদের পক্ষে প্রায়শই ঘটে যেত এমনটি। মুনি-ঋষি এমনকি দেবতাদেরও আত্মসংযমের অভাব দেখা দিত ইতরজনের মতই। আর বসু তো সামান্য রাজা! কাজেই প্রশ্নটা বীর্যপাতের নয়, প্রশ্নটা কী এমন মন্ত্র বলে বীর্য শোধন করেছিলেন তিনি?

প্রসঙ্গক্রমে হাল আমলের নলজাতকের কথা স্মরণ হতে পারে অনেকেরই। কিন্তু মনে রাখতে হয়, যে জাতের প্রক্রিয়ায় নলজাতকের জন্মক্ষেত্রে পুরুষ শুক্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা হয় এখানে তার অবকাশ ছিল না একেবারেই। বায়ুর সংস্পর্শে এলেই বংশানুকীট নষ্ট হয়ে যাওয়া অবধারিত। অথচ চেদিরাজের মন্ত্রের জোর এমনই যে দুই শ্যেনপক্ষীর দীর্ঘকালীন তুণ্ডযুদ্ধের অবসরেও তা নষ্ট হয়নি আদৌ। পরম ধার্মিক রাজা উপরিচরের মন্ত্রবলের তুলনা হয় না স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন জাগে পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে। প্রতিদ্বন্দী শ্যেনপক্ষীর চোখে বীর্যবাহক শ্যেনপক্ষীর চঞ্চুস্থিত রেতঃ বস্তুর রঙ ও আকার মাংসখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হল কি করে? স্খলিত রেতঃ পদার্থের রঙ তো শ্বেত বর্ণই হয় সাধারণতঃ। ব্যতিক্রমের কথা আমাদের জানা নেই অদ্যাবধি। জমাট শুক্র বরফ খণ্ডের মত শক্ত ও শুভ্রাকার ধারণ করলে বরং কিছুটা মানানসই হত কিন্তু তা মাংসখণ্ডের ন্যায় রক্ত বর্ণাকার ধারণ করল কিভাবে? বস্তুতঃ এমন আজগুবী বর্ণনার বিষয় যা একান্তই আমাদের অবাঙ্মনসগোচর।

মানুষের জন্মরহস্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানাভাব থাকলেও সাধারণ বোধে এটুকু অন্ততঃ বলা চলে যে মৎস্যগন্ধার জন্ম বৃত্তান্তের অন্তরালে রয়েছে বিরাট এক ফাঁক-ফাঁকির কারসাজি। গল্প কথার আবরণে আসল কথা চাপা দেবার অপচেষ্টা। এ যুগের মানুষ কেন, মহাভারতের যুগের মানুষদেরও

বোকা ঠাওরাবার কারণ নেই কোনো। আমাদের সরল বুদ্ধিতেই আমরা বুঝতে পারি যে, এবম্বিধ উদ্ভটতত্ত্ব আমদানীর পেছনে বেদব্যাসের বদ অভ্যাসের আসল উদ্দেশ্য সেকালের ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্ণ ও বিত্তসম্পন্ন লোকেদের কুকীর্তিকে ধর্মের নামে বেমালুম আড়াল করার চেষ্টামাত্র। ধর্মের নীতি অতি সূক্ষ্ম বলে যতই প্রচার করুন তিনি, আমাদের পক্ষে তা বিশ্বাস করা একান্তই কঠিন। ধার্মিক প্রবররা হয়তো ভাবতে পারেন, ঈশ্বরের সদিচ্ছায় মাছের পেটে ডিমের বদলে জোড়া পুত্র-কন্যার আবির্ভাব অসম্ভব ঘটনা কিছু নয়। বিশেষ করে মাছটি যখন শাপগ্রস্তা প্রধান অপ্সরা বিশেষ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মন তা মানতে চাইবে না কিছুতেই।

মহাভারতের সব আখ্যানভাগের সঙ্গেই জোড়া আছে অসংখ্য ফ্ল্যাশব্যাক অর্থাৎ অতীত ঘটনা বিধৃত উপকাহিনী। একদা ব্রাহ্মণের অভিশাপে অপ্সরা প্রধান অদ্রিকা প্রাপ্ত হয়েছিলেন মীনরূপ। এমন হীনরূপ প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ প্রদানকালে ইন্দ্রদেব তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন—"তুমি মানুষ প্রসব করিয়া শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।" একথার পরিপ্রেক্ষিতে এখন যদি কেউ বিবর্তনবাদের দোহাই পেড়ে বলেন যে, জলচর প্রাণী থেকে উভচর প্রাণী আর তা থেকে স্থলচর প্রাণীর উদ্ভবের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমানের পেছনে ছিল একজাতীয় মাছের অস্তিত্ব। সেই মাছের সাধারণ দু'টি পাখনা ছাড়াও সামনের দিকে ছিল আরও দুটি পাখনা। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই চারটি পাখনাই তো পাখীর দু'টি পা আর দু'টি ডানা হয়ে দেখা দিয়েছে ভবিষ্যতে এবং সৃষ্টি করেছে বর্তমানকালের জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের দু'টি হাত ও দু'টি পা। সুতরাং এই বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রা কাড়বার ক্ষমতা আমার কেন, স্বয়ং ডারউইন সাহেবের ছিল কি-না সন্দেহ! তিনি তো কেবল প্রাণীর বিবর্তনের কার্য-কারণ সম্পর্কের উল্লেখ করে দায় সেরেছিলেন। যদিও পরবর্তী বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে ও আবিষ্কারে সেই অনুমান ইদানীং সত্যে পরিণত ও প্রমাণিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

পাঁচকোটি বছর আগে যে জাতীয় মাছের পাখনা থেকে পাখীর পা আর পাখা গজিয়েছিল; গজিয়েছিল মানুষের হাত পা, পৃথিবীর মৎস্যকুলে কোনো মাছের শরীরে তেমন পাখনার সন্ধান মেলেনি দীর্ঘকাল। আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলাম প্রায়। এমন সময়ে শোনা গেল সেই শ্লোগান—ডারউইন যুগ যুগ জীয়ে, যুগ যুগ জীয়ে। ব্যাপার কী!

তত্ত্ব-তল্লাশে জানা গেল, ডারউইন সাহেবের অভিব্যক্তিবাদের অনুমান একান্তই অভ্রান্ত। সামঞ্জস্য বিধানের সেই মৎস্যপ্রভুর সন্ধান মিলেছে সম্প্রতি। এই মাছের নাম 'কয়লাকান্ত'।[৬] কয়লাকান্ত যেন মৎস্যরূপী শ্রীকান্ত অর্থাৎ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার। কয়লাকান্তে ফোঁপরা ছাড়াও দেখতে পাওয়া গেছে নীচু ধরনের ফুসফুস। এতদিনে বিজ্ঞানীদের শরীর থেকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল—ঘুসঘুসে জ্বর। পাওয়া গেল পাখি ও মানুষের পূর্বপুরুষের সাক্ষাৎ সন্ধান। তবে একথা ভাবলে ভুল হবে যে, এই মাছই ক্রমবিবর্ত্তিত হয়ে উভচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্ত্তীকালে। তা হয়ে থাকলে তো কয়লাকান্তরই সাক্ষাৎ মিলত না। অবলুপ্ত হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন বুঝতে হবে যে, কয়লাকান্তেরই একটি শাখা এগিয়ে গেছে উভচর প্রাণী হবার পথে। বিবর্ত্তিত সেই শাখা আজ অবলুপ্ত। এই মাছের নাম বিপিডিসটিয়া। কয়লাকান্ত হল বিপিডিসটিয়ার হারানো অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ।

বিজ্ঞানের বিচারে মাছের পেটে মানুষের জন্ম নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা। কাজেই মৎস্যগন্ধার জন্মবৃত্তান্তের পেছনে বাস্তব দৃষ্টিতে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে সেকালের সমাজব্যবস্থার স্বরূপ। ভারতীয় সমাজপদ্ধতিতে "বৈদিক কৌমগুলির রাজাদের স্তুতিগায়কেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত, পরে ইহারা বংশানুক্রমিক 'ব্রাহ্মণ' হয়। অবশেষে শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে প্রত্যেকের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া 'অজেয়' এবং 'অবধ্য' বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এই ভাটেরাই কালক্রমে "ঋষি" বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিল।"[৭] বস্তুতঃ মহাভারতের যুগে শাসক ক্ষত্রিয়ের শাসন যন্ত্র এবং তাদের তাঁবেদার ব্রাহ্মণদের পুরোহিততন্ত্র বৈদিক যুগের শেষে ভারতের মাটিতে ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত। গুণকর্মানুসারে সুপ্রতিষ্ঠিত চতুর্ব্বর্ণের বিধান। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যবর্গের স্বার্থ হয়ে উঠেছে সমভাবাপন্ন। উভয়ে মিলিত হয়ে শোষণ করত জনসাধারণকে। এই দুই শ্রেণীর লোকের সমস্বার্থের পরিচয় রয়েছে বাজসনেয় সংহিতায় "পুরোহিতদের দৃঢ় কর, ক্ষত্রিয়দের দৃঢ় কর।"[৮] শুদ্ধ সাজ পরিহিত ব্রাহ্মণরা যুদ্ধবাজ রাজার মহিমা কীর্ত্তন করে বেড়াতেন দেশে-বিদেশে। কাজেই রাজাদের লাম্পট্যের কথা যথাসম্ভব চাপা দিতে হয়েছে তাদের প্রচারযন্ত্র কাব্যকথায় এবং কথকতায়। পুরস্কারস্বরূপ রাজমহিমা কীর্ত্তনীয়ারা আখ্যাত হয়েছেন মুনি-ঋষি রূপে। মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না কোনোক্রমেই। তিনি অসংযমী রাজা উপরিচর

বসুর লাম্পট্যের কথা চাপা দিতেই অবতারণা করেছেন শ্যেনপক্ষীর উদ্ভট উপাখ্যান। আসলে ধীবর কন্যা পরমাসুন্দরী অদ্রিকার রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে তার সতীত্বনাশ করেন রাজা। কাহিনীতে বলা হয়েছে শাপগ্রস্তা মৎস্যরূপী অপ্সরা। ধীবর কন্যার সঙ্গে সহবাসে দুর্নামের আঁশটে গন্ধ যমুনার জলে ধুয়ে ফেলেছেন উপরিচর। অভিজাত লোকেদের পক্ষে গায়ের জোরে শূদ্রা রমণীদের সম্ভোগ করা ছিল মৃগয়া তুল্য। এতে আয়ুধের কাজ করেছে সামাজিক বিধি-বিধান, ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন এবং যার পেছনে কার্যকর ছিল রাজশক্তির পূর্ণ অনুমোদন। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই যেসব ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল তার মধ্যে আপস্তম্ভ, গৌতমসংহিতা, বৌধায়ন সূত্র ইত্যাদি সব চাইতে প্রাচীন। এদের মধ্যে আবার গৌতম সংহিতা অন্যতম। সে যুগে গৌতম যেসব শাস্ত্রীয় বিধানের নিধান হেঁকেছিলেন শূদ্রদের পক্ষে তা ছিল প্রাণঘাতী। মহাভারতের যুগে সেই নীতি অনুসৃত হয়েছে পূর্ণমাত্রায়। তার মধ্যে কয়েকটি যেমন :

(ক) "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র কর্তৃক শূদ্রা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান পরাশর, যবন, করণ এবং শূদ্র এই আখ্যাসমূহ প্রাপ্ত হইয়া যায়।"[৯]

মন্তব্য : পরাশর মুনিও সম্ভবতঃ কোন নিশ্চিত কোনও শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান এবং সে কারণেই তার নাম পরাশর অর্থাৎ নামেই পরিচয়।

(খ) "উচ্চবর্ণের লোক দ্বারা তাহার ঠিক নিম্ন কিম্বা তাহারও পরের বর্ণের কন্যার দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পাঁচ ও সাত পুরুষ পর্যন্ত নিজের জাতের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে পারে।"[১০]

মন্তব্য : যেমন পেরেছেন পরাশর মুনি ও তার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন!

গ) "কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের নিকট ত্রুটি অথবা অন্যায় করিলে কিম্বা তাহাকে আঘাত করিলে, যে অঙ্গদ্বারা সে এই দুষ্কর্ম করিয়াছে, রাজা উহা ছেদন করিয়া দিবেন।"[১১]

মন্তব্য : শ্রেণীস্বার্থে রাজশক্তির প্রয়োগ।

ঘ) "কোন শূদ্র যদি জানিয়া শুনিয়া কোন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত সহবাস করে তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইবে।"[১২]

মন্তব্য : শ্রেণীস্বার্থে সামাজিক দণ্ডবিধির কঠোরতা।

৬) "যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে ঠকাইয়াছে বা তাহার জিনিষ চুরি করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। যে শূদ্র বিছানায় অথবা আসনে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইতে চায় কিম্বা রাস্তায় ব্রাহ্মণকে সমকক্ষ ভাবিয়া তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করে, তাহার একশত 'পণ' জরিমানা হইবে।"[১৩]

মন্তব্য : নিষ্প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে গৌতমসংহিতায় শূদ্রশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কোনো বিধি-ব্যবস্থা ছিল না। নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করলে সেই পুত্র ছিল কোনো প্রকার ধর্ম-কর্ম-শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদির অনুপযুক্ত। কোনও শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ দুর্ব্যবহার করলে তার অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কোনও শাস্তি হত না। বস্তুতঃ অভিজাত শ্রেণী ও ব্রাহ্মণগণের অভাব ছিল নারীর। অভাব ছিল পুত্রের। সে কারণে শূদ্রা রমণীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও বর্তে যেতেন তাঁরা। কিন্তু তার জন্য শূদ্রা রমণীকে সামাজিক মর্যাদা দেবার প্রয়োজন ছিল না সচরাচর। আমরা উপরিচর বসুর কাহিনী থেকে দেখতে পাই অদ্রিকার গর্ভজাত দুটি সন্তানের মধ্যে পুত্র সন্তানকে গ্রহণ করেছিলেন রাজা এবং সেই পুত্র কালক্রমে হয়েছিলেন পরমধার্মিক স্থিরপ্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ আর ভাগ্যক্রমে সত্যবতী হয়েছিলেন রাজা শান্তনুর পত্নী। কিন্তু সত্যবতীকে রাজা উপরিচর বসু ধীবরের ঘরেই প্রতিপালনের জন্য রেখেছিলেন শৈশবে। কেন এই ব্যবস্থা? প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মৎস্যজীবীরা ছিল হীনজাতি। শাস্ত্রীয় বিধান থাকলেও শূদ্রানী গমন ছিল নিন্দনীয়। মহাভারতের যুগে অন্ততঃ লোকনিন্দার বিষয় হয়ে উঠেছিল। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে রূপকথার আবরণে আসল ইতিহাস চাপা দিয়েছেন ব্যাসদেব। আর এতে সন্দেহের অবকাশ ঘটেনি তেমন। কেননা, মহাভারত শুধুমাত্র সামাজিক ইতিহাস নয়; নয় নিছক রূপকথার সমষ্টি। ভারতের অতি প্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংমিশ্রণে রচিত মহাকাব্য এই মহাভারত।

সহায়ক গ্রন্থ :—

১. মহাভারতম—মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ/বিশ্ববাণী প্রকাশন

২. মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূবাদিত/সাক্ষরতা প্রকাশন
৩. মহাভারত—রাজশেখর বসু কর্তৃক সারানুবাদ/এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স
৪. ভারতীয় সমাজপদ্ধতি (১ম খণ্ড) ডঃ 'ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত/বর্মন পাবলিশিং হাউস
৫. দানিকেনের বিভ্রান্তি—সমীরণ মজুমদার/মৌসুমী প্রকাশনী
৬. আমরা কেন আমাদের মত দেখতে—অরূপরতন ভট্টাচার্য/আশা প্রকাশনী
৭. হিন্দু সমাজের গড়ন—নির্মল কুমার বসু/লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা/বিশ্বভারতী
৮. কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির—বীরেন্দ্র মিত্র/নাথ ব্রাদার্স

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১. আদিপর্ব / কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত / পৃষ্ঠা—৩ / সাক্ষরতা প্রকাশন
২. রাজোপরিচরো নাম ধর্ম্মনিত্যো মহীপতিঃ।
বভুব মৃগয়াশীলঃ শশ্বৎ স্বাধ্যায়বান্ শুচিঃ ॥১॥
৩. আদিপর্ব / কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত / পৃঃ ৬৩ / সাক্ষরতা প্রকাশন / প্রথম প্রকাশ।
৪. কালীপ্রসন্ন'র মহাভারত / পৃঃ ৬৫ / সাক্ষরতা প্রকাশন।
৫. ক্রোমসোম সূত্রই মানুষের বংশগতি রহস্যের মূল কারণ। ক্রোমসোমের মুখ্য রাসায়নিক উপাদান হল নিউক্লিক এ্যাসিড ও প্রোটিন। দু'প্রকারের নিউক্লিক এ্যাসিড, আর. এন. এ এবং ডি. এন. এ ক্রোমসোমের ভিতর পাওয়া যায়। শতকরা হিসাবে ৪৫ ভাগ ডি. এন. এ অর্থাৎ ডি. অক্সি রাইবো নিউক্লিক এ্যাসিড আর ১·২ থেকে ১·৪ ভাগ আর. এন. এ। বাকী অংশ প্রোটিন। এই ডি. এন. এ-ই হোল জীবনের উপাদান। মানুষের ক্রোমসোমের সংখ্যা হল ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি মাত্র।
৬. ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রে, ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালে মাদাগাস্কারে সন্ধান পাওয়া গেছে কয়লাকান্তর। অনুমান করা হয় যে, সমুদ্রের তলদেশে পাহাড়ের গুহায় যে জল বহু বছর ধরে প্রবল নড়াচড়া সত্ত্বেও অপরিবর্ত্তিত সেখানেই টিকে ছিল এই ধরনের মাছ।
৭, ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি (১ম খণ্ড), সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৫৭ / পৃঃ—১১৯ / ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
৮. বাজসনেয় সংহিতা (৫,২৭)—সূত্রঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ / পৃঃ ১১১
৯. গৌতম সংহিতা—চতুর্থ অধ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়
১০. ঐ
১১. ঐ ১২. ঐ ১৩ ঐ—দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়।

২ঃ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস

মহাকবি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁর নিজের বিচিত্র জন্মকথা নিজের হাতেই লিখে গেছেন মহাভারতে। মহর্ষি পরাশরের ঔরসজাত এবং মৎস্যগন্ধার কানীন পুত্র হিসাবে তাঁর বিশেষ পরিচয়। তিনি যে জননী সত্যবতীর জারজ সন্তান সে কথা কোথাও লুকোছাপা নেই।

মৎস্যগন্ধা তার পালক পিতা ধীবর রাজের সাহায্যার্থে খেয়ানীর কাজ করতেন যমুনা নদীতে। একদা তীর্থ পরিক্রমায় বহির্গত হয়ে সেই খেয়া ঘাটে এসে হাজির হলেন মহর্ষি পরাশর। পরমা সুন্দরী সত্ত যুবতী মৎস্যগন্ধাকে দেখে কামার্ত্ত হয়ে পড়লেন তিনি। মনোভাব গোপন না করেই পুত্রার্থে পরাশর তাঁর সহবাসের কামনা ব্যক্ত করলেন সেই অকুস্থলে।[১] মৎস্যগন্ধা পরপারে অপেক্ষমান ঋষিগণের দৃষ্টির সামনে সঙ্গমে অপারগতা জ্ঞাপন করাতে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি করলেন মহর্ষি।[২] বিস্মিতা ও লজ্জিতা মৎস্যগন্ধা তখন মহর্ষিকে বললেন— "ভগবন্, আমি কুমারী এবং পিতার অধীন। আপনার সঙ্গে সহবাস করলে আমার কুমারীত্ব নষ্ট হবে। বাড়ীতে আমি কি ভাবে ফিরে যাব? কি ভাবেই বা বেঁচে থাকব? আমার অবস্থা বিবেচনা করে যা করতে হয় করুন।" কুমারী কন্যা মৎস্যগন্ধার কথায় খুশী হয়ে মহর্ষি বললেন—"আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে তোমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই থাকবে। এখন তুমি কি বর চাও, তাই বল।" মৎস্যগন্ধা তখন তার গায়ের আঁশটে গন্ধের পরিবর্তে মিষ্টি গন্ধ চাইলেন।[৩] প্রভাবশালী মহর্ষি তাঁকে প্রার্থিত বর প্রদান করলে পর নারীর সহজাত স্বভাব-সৌন্দর্য ও রমণকালীন ধৃষ্টতাসম্পন্না অশেষ গুণশালিনী সত্যবতী অদ্ভুতকর্মা পরাশরের সঙ্গে মিলিত হলেন, অসঙ্কোচে। মিলনের ফলে সত্ত সত্তই গর্ভধারণ এবং এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন গন্ধবতী।[৪] এই পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ। যমুনাদ্বীপে জন্মেছিলেন বলে 'দ্বৈপায়ন'। তাঁর তপস্যাক্ষেত্র বদরিকাশ্রম বলে বলা হয় 'বাদরায়ন'। তপোবলে বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন বলে 'বেদব্যাস' নাম হয়েছিল তাঁর। জন্মের পরমুহূর্তেই তিনি জননীর অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন তপস্যার কারণে। যাবার সময় বলে গেলেন, "মাতঃ! কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব।"[৫]

গল্পকার হিসাবে ঋষি বাদরায়ন এযুগের গল্পকারদেরও ঈর্ষার কারণ হতে পারেন বস্তুতঃ। কিন্তু কতকগুলি জায়গায় এমন উদ্ভট তত্ত্ব আমদানী করেছেন যে সাধারণের চোখেও তা অসম্ভব, অবাস্তব এবং অসঙ্গত বলে মনে হতে পারে সহজেই। মহাভারত যদি শুধুমাত্র রূপকথার কাহিনী হত তা হলে কারো মনে এ প্রশ্নের উদয় হোতো না আদৌ কিন্তু যে মহাগ্রন্থ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার আদি ইতিহাসও বটে তাকে নিছক ঠাকুরদা'র বা ঠাকুরমা'র ঝুলির মধ্যে ফেলে একাকার করা যায় কী করে! স্বয়ং বেদব্যাসের জন্ম এমন এক উদ্ভট কাহিনীর উৎস। সত্যবতী পরাশরের সঙ্গম মুহূর্তেই সন্তানের ভ্রূণরূপ এবং প্রসব লাভ কোনও সামান্যতম সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারেন কিনা সন্দেহ। জন্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকা এককথা কিন্তু সন্তানকে যে দশমাস গর্ভে ধারণ করেই একদিন নাড়ীর বাঁধন ছিন্ন করতে হয় জননীকে এতো অতি সাধারণ জ্ঞানের কথা! মৎস্যরূপিনী অপ্সরা অদ্রিকার গর্ভে দশমাস অবস্থান করে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছে মৎস্যগন্ধাকে অথচ তার গর্ভজাত সন্তানের বেলায় জন্ম নিতে সময় লাগল মাত্র কয়েক মুহূর্ত। এ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা! নারীর গর্ভে পুরুষের বীর্য নিষেক মাত্র পূর্ণাবয়বের সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয় কোনোক্রমেই। কাজেই, মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, নিজের জন্ম সম্বন্ধে এমন অলৌকিক কাহিনীর আশ্রয় নিলেন কেন সত্যসন্ধ বেদব্যাস? মোটেই বোকা নন তিনি। যিনি বেদকে ভাগ করেছেন, লক্ষ শ্লোকে মহাভারতের মত পঞ্চম বেদ রচনা করেছেন, রচনা করেছেন হরিবংশ-এর মত মহাকাব্য স্বভাবতই তিনি বোকা হবেন কোন দুঃখে! বরং বোকা বানিয়েছেন অগণিত পাঠককে। পাঠকবর্গ যাতে তার অবৈধ জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন না তোলে কিংবা অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে তার জন্যে চতুরালির আশ্রয় নিয়েছেন অলৌকিকত্বের আড়ালে।

মহাভারতের যুগের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, "স্ত্রীপুরুষ অসংকোচে তাদের কামনা ব্যক্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়।"[৬] কিন্তু জারজ পুত্রের জননী যে সমাজে সমাদৃতা হতেন না কোনোক্রমেই—তা সত্যবতী বা কুন্তীর কাহিনী বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে সহজেই। মহাভারতে "মনুষ্যজন্মের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শনের ঝোঁপ বা কলসীতেও জরায়ুর কাজ হয়"[৭] এমন অনেক অযৌক্তিক অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে মুনি-ঋষিদের বেলায়! মহাভারতের মত অতি প্রাচীন ইতিহাসের আকর গ্রন্থে কেন এমন আজগুবি গল্পের আমদানী? আসলে রূপক বা

রূপকথার আড়ালে প্রথিতযশা ঋষি পুরুষদের অসামাজিক জন্মের কেলেঙ্কারী চাপা দেবার চেষ্টা মাত্র। দেব-দ্বিজে অহেতুক ভক্তি বা বিশ্বাসবশতঃ পাঠকরা এঁদের জন্ম সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেন না কদাচ। অপ্সরাগণের গর্ভে ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গ অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বিস্তর কিন্তু তাদের সঠিক জন্ম-পরিচয় বিধৃত নেই সবিস্তারে। মনে প্রশ্ন ওঠে, কারা এই অপ্সরা? কেনই বা তাদের সন্তানদের পরিচয় বিধৃত নেই যথাযথ? এবম্প্রকার যাবৎ প্রশ্নের তাবৎ উত্তর ছড়িয়ে আছে মহাকাব্যের যুগের ইতিহাসে। অধ্যবসায় সহকারে শুধু খুঁজে পেতে হবে আমাদের।

মহাভারতের মত মহাকাব্যিক যুগের ইতিহাস এক ক্রান্তিকালের লিপিবদ্ধ সামাজিক ঘটনাপুঞ্জের বিবরণ আর কিছু নয়। বৈদিক যুগের শেষে বা তার অব্যবহিত পরেই শুরু হয় এই মহাভারতের যুগ। আনুমানিক খ্রীষ্টপুর্ব ১০০ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই কালপর্ব প্রসারিত। ত্রয়ীর শেষ যজুর্বেদের রচনাকাল ১০০০—৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে অনুমিত। এরই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ পাওয়া যায় খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দের অনেক সামাজিক বৃত্তান্ত। নব্য পুরোহিত তন্ত্রের আবির্ভাবে যজুর্বেদীয় যজ্ঞবিধির রীতি-নীতি পুরাদস্তর অনুসৃত হয়েছে মহাভারতের যুগে। যাই হোক, বৈদিক যুগের শেষে আর্যেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পঞ্চনদীর তীর থেকে এগোতে থাকেন পূর্বদিকে। তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ অনুসারী ভারতীয় আদিবাসীদের সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক আর্যদের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মৎস্য, কর্ম, নাগ ইত্যাদি কুলচিহ্নধারী অর্থাৎ টোটেম বিশ্বাসী আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘাতে ক্রমে জয়ী হতে থাকেন পশুপালক যোদ্ধ যাযাবর আর্যরা। পরাজিত আদি অধিবাসীদের তারা আখ্যা দিলেন দাস বা দস্যু। এই দাস বা দস্যুরা শূদ্ররূপে পরিগণিত হলেন আর্যসমাজে। সৃষ্টি হল চতুর্থ বর্ণের।

আর্যরা ভারতে আগমনের কালে যত গোরু সঙ্গে এনেছিলেন তত জরু অর্থাৎ স্ত্রীলোক আনতে পারেননি সঙ্গে। জরুরী হয়ে উঠেছিল বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজন। তখনকার দিনে ধন বলতে বোঝাত গোধন অর্থাৎ গোরু যার থেকে গোত্রের উদ্ভব আর জন বলতে পুত্র সন্তান। যে দলের দুইই অধিক ছিল, ধনে-জনে তারাই ছিল সমৃদ্ধ। আর্যদের চোখে নারী ছিল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। ধর্মের দোহাই পেড়ে তাই বলা হোত—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।' অথচ প্রাক্ আর্যযুগে এদেশের রমণীরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনা।

মহাভারতের যুগে নাগরাজকন্যা উলুপী বা মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে তার কিঞ্চিদ আভাস মেলে মাত্র। যাই হোক, আর্যরা এদেশীয় নারী রত্নকুলের যত্ন-আত্তি বা সামাজিক মর্যাদা তেমন না দিলেও তাদের গর্ভজাত পুত্রেরা পেয়েছে প্রভূত সামাজিক মর্যাদা। বস্তুতঃ পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজে বীর্যশুল্কে ক্রীত হয়েছে নারীর ইজ্জত।

মহাভারতীয় যুগের অব্যবহিত পূর্বে নব্য পুরোহিততন্ত্রের উদ্ভবপর্বে যে সাত জন ঋষির নাম পাওয়া যায় তাঁরা সকলেই ছিলেন অসবর্ণ মিলনের শ্রেষ্ঠ ফল। একমাত্র অষ্টম পুরোহিত বিশ্বামিত্র ছিলেন খাঁটি ক্ষত্রিয়। বশিষ্ঠ ছিলেন নয়া পুরোহিত তন্ত্রের প্রধান। বশিষ্ঠ অর্থে বিশিষ্ট অতিভদ্র (most excellent) কুশিক কুলের (পেচক গোষ্ঠির) বনেদী পুরোহিত বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের বিবাদ বেধেছিল নতুন পুরোহিততন্ত্রের প্রচলনে। দশরাজার বিজয়গাথার স্তুতি-গায়ক বশিষ্ঠ গোষ্ঠির চতুর্থ পুরুষ হলেন বর্তমান আখ্যায়িকার নায়ক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।[৮] কিন্তু বিশিষ্ট ঋষি বশিষ্ঠদেবের মাতৃনামের কোনো উল্লেখ নেই কোথাও। দুই বৈদিক দেবতা মিত্র এবং বরুণের যৌথ বীর্যে কলসীর ভিতরে তাঁর জন্ম। কলসী এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো শূদ্রা রমণীর গর্ভের প্রতীক। অনুমান হয় যে, তখনকার দিনে একই শূদ্রা নারীতে উপগত হতেন একাধিক আর্য পুঙ্গব। এতে নারীর অভাব সূচিত হয় একান্তই। নব্য পুরোহিততন্ত্রের অন্যতম পাণ্ডা অগস্ত্য ঋষিরও কোনো মাতৃপরিচয় পাওয়া যায়না ব্রহ্মাণ্য শাস্ত্রে। তাঁরও জন্ম কলসীর ভিতরে। এ থেকে অনুমান দৃঢ়মূল হয় সঙ্গত কারণেই।[৯] আর্য সমাজে নব্য পুরোহিততন্ত্রের একচেটিয়া দাবীদার ঋষি পুরুষদের উদ্ভব হয়েছিল আর্য এবং ভারতের আদি অধিবাসী শূদ্রজাতির সংমিশ্রণে। এই সঙ্কর জাতির পুরোহিতরাই জন্ম দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ জাতির। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির জাতি ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কোশাম্বী মন্তব্য করেছেন যে, "The adoption of such Jar-born seers into the high Aryan Priesthood was a fundamental innovation. By such recombination of Aryan and autochthone (aborigines), a new class of specialists developed which would eventually claim monopoly of all Aryan ritual—The Brahmin Caste."

ব্যাসদেবের মা সত্যবতীর গর্ভধারিণী জননীকে বলা হয়েছে শাপগ্রস্তা মৎস্য-রূপিণী অপ্সরা। বস্তুতঃ জেলের ঘরের মেয়ে ছিলেন অদ্রিকা। জলের কূলে যাদের

ঘর, মাছ ধরা যাদের জীবিকা তাদের কুলচিহ্ন 'মৎস্য' হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে জেলেরা ছিলেন হীনজাতি শূদ্র। তাদের ঘরের মেয়ে যারা রূপবতী-গুণবতী হতেন তারা অনেকেই বেছে নিতেন 'বেশ্যা' বৃত্তি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় শূদ্রের চাইতে বেশ্যারা ছিলেন ঢের ঢের সম্মানীয়া। তাঁরা হতেন না শূদ্রের, না ভদ্রের। কাজেই শূদ্রকন্যাকে শাপগ্রস্তা অপ্সরা বলায় রক্ষা পেয়েছে শ্রেণীর সম্মান। অপ্সরা শব্দের 'অপ' অর্থে জল এবং 'সরা' অর্থে জল-বিহার বুঝায় সচরাচর। অবশ্য স্বর্গবেশ্যা হিসেবেই অপ্সরারা আমাদের কাছে সবিশেষ পরিচিতা।[১০] ভারতীয় সমাজে এই ট্রাডিশন প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। বৌদ্ধযুগের আম্রপালি[১১] বা বসন্তসেনার মত নৃত্যগীত পটীয়সী রূপসী মহিলারা কারো গৃহবধূ না হয়ে বেছে নিয়েছেন রাজনর্ত্তকীর জীবন। সাধারণ রমণীদের চাইতে উঁচুদরের গণিকাদের একটা কদর ছিল সমাজে। কিছুদিন আগেও যেমন ছিল বাইজীদের। এঁরা রূপে-গুণে, নাচে-গানে অশেষ গুণবতী হলেও স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করায় সাধারণের চোখে ছিলেন নিন্দনীয় কিন্তু রাজদরবারে, অভিজাত মহলে অর্থাৎ সমাজের উঁচুতলায় এঁদের খ্যাতি ও খাতির ছিল অসামান্য।

গন্ধকালী অর্থাৎ সত্যবতীকে যত কথা বলেছেন পরাশর মুনি তার মধ্যে আসল কথা হোল—"ভদ্রং তে যাচে বংশকরং সুতম্। সঙ্গমং মম কল্যাণি।" শূদ্রা সত্যবতীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চাননি একটিবারও—চেয়েছেন শুধু সঙ্গম করতে এবং তার ফলস্বরূপ একটি পুত্র সন্তান। অবশ্য আগে থেকেই তিনি তপোবনে জানতে পেরেছিলেন যে সত্যবতীর সঙ্গে তার মিলন হবে এবং অমিত-তেজা পুত্রসন্তান লাভ করবেন। মৎস্যগন্ধার পূর্ণ জন্মের বৃত্তান্ত শুনিয়ে তার মন নরম করেছেন পরাশর। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও শুনিয়েছেন যে, সে ধীবরকন্যা-রূপে পরিচিতা হলেও বস্তুত শূদ্রা রমণী নয়, উপরিচর বসুর কন্যা অর্থাৎ অভিজাত। কিন্তু মৎস্যগন্ধা জেলের ঘরে প্রতিপালিতা। কাজেই তার গায়ে আঁশটে গন্ধ ছাড়া ফুলের তেলের গন্ধ আসবে কোথা থেকে? এ-কারণে গন্ধকালী তার গায়ের আঁশটে গন্ধের কথা বলে রমণে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে মুনিবরকে। পরাশর সম্ভবত কস্তুরী মৃগের সহায়তায় মৎস্যগন্ধাকে যোজনগন্ধায় পরিণত করেছেন মুহূর্তে এবং বলেছেন—'সঙ্গমং মম কল্যাণি।' নিরুপায় কল্যাণী তখন পরপারে অপেক্ষমান ঋষিদের দৃষ্টির কথা ভুলে সংযত হতে বলেছেন পরাশরকে। নাছোড়বান্দা পরাশর অগত্যা কুয়াশা সৃষ্টি করে বলেছেন—'সঙ্গমং মম কল্যাণি।' মনে হয় শীতের কোনও সন্ধ্যাকালে খেয়া পারাপারের ঘটনা এটি। কেননা, শীতকালে নদী হয়ে

থাকে ক্ষীণ কলেবরা এবং সন্ধ্যাবেলায় নদীর উপর দ্রুত নেমে আসে কুয়াশা। পরাশরের উক্তিই এবম্প্রকার, ধারণার ভিত্তিভূমি। তিনি বলেছেন—"কলসাং ভবিতা ভদ্রে! সহস্রার্দ্ধেন সম্মিতম্। অহং শেষো ভবিষ্যামি" ··অন্যার্থ বিশাল নদী আমার অনুগ্রহে হাজার ভাগের একভাগ হয়ে যাবে এবং আমিই হব আজ শেষ আরোহী। পারে যাবার শেষ আরোহী অবশ্যই সাঁঝ বেলাকার; সকাল বেলার নন কথনই। আর খেয়াকে যখন কুয়াশা ঘিরেছে তখন শীতকাল ছাড়া অন্য ঋতু হওয়া সম্ভব নয়। এত সব কাণ্ড-কারখানার পর সঙ্গমে আর আপত্তি চলেনা কদাচ। অতএব সঙ্গম হল। আমাদের আপত্তি হল এখানেই। অবশ্য তা সঙ্গমে নয় সন্তান সমাগমে। প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত সঙ্গমের পর নারীর সন্তান ধারণে আমাদের আপত্তি থাকবার কথা নয়, আপত্তি সশরীরে ব্যাসদেবের আগমনে। কলমের জোরে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন তিনি। কলমের জোরেই সন্তানবতী সত্যবতীকে করেছেন কুমারী কন্যা! সত্যি কথা বলতে গেলে, এ আর এমন বড় কথা কী! এমন ঘটনা আজকালকার দিনেও ঘটে থাকে হামেশাই। কোনও নার্সিং হোমে অবৈধ সন্তান প্রসবের পর কুমারী কন্যা সেজে ঘরে ফিরে আসেন অনেক জননীই। কিন্তু তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। সত্যবতীরও সেই সময়টুকুর প্রয়োজন হয়েছিল অন্তত। ব্রাহ্মণের অসীম প্রভাব জাহির করতে গিয়ে অলৌকিকত্বের আবরণে সত্যকে নস্যাৎ করেছেন ব্যাসদেব। তবে যা কিছু করেছেন ব্যাস সবই তা ব্রাহ্মণের শ্রেণীস্বার্থে।

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১. ভদ্রং তে যাচে বংশকরং সুতম্। সঙ্গমং মম কল্যাণি।

২. সাব্রবীৎ পশ্য ভগবন্! পরপারে স্থিতানৃষীণ।
আবয়োদৃষ্টয়োরেভিঃ কথং নু স্যাৎ সমাগমাঃ।
এবং তয়োক্তো ভগবান্ নীহারম সৃজৎ প্রভুঃ।···

৩. এবমুক্তা বরং বব্রে গাত্র সৌগন্ধ্যমুত্তমম্।
স চাস্যৈ ভগবান প্রাদান্মনসঃ কাঙ্ক্ষিতং প্রভুঃ।
পরাশরেণ সংযুক্তা সদ্যো গর্ভং সুষাব সা।
যজ্ঞে চ যমুনাদ্বীপে পারাশর্য্যঃ স বীর্যবান্।
স মাতরমনুজ্ঞাপ্য তপস্যেব মনো দধে॥

৪. কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত।

৬. ভূমিকা, রাজশেখর বসু অনুবাদিত মহাভারত।

৭.

৮, বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি, তস্যপুত্র পরাশর এবং পরাশর পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস।

৯. "Vasistha, however, was new type of priest. He was begotten of the seed of vedic gods Mitra and Varuna, once the sun and the sky god respectively. His mother is not mentioned on the contrary, he was—in one and the same account—'born of the mind of Urvasi' (an apsaras or water goddess); born also of a jar which received the combined semen of the two gods and discovered 'clad in the lightning' in a Puskara. This apparently confused narrative in really quite consistent and straight forward. It means that Vasistha came of the human representatives of a Pre-Aryan mother goddess and as such had no father. Going over to the Patriarchal Aryans required some respectable father and at the same time a denial of the non-Aryan mother. Agastya, founder of another major brahmin clan group still extant, was similarly born of a jar. The jar represents the womb and thereby the mother goddess,"

—The culture and civilisation of Ancient India in Historical outline—D. D. Kosambi/Page—83

১০, অপ্সরা: দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্রগর্ভ উদ্ভূত স্ত্রীজাতি, অপ্ (জল) থেকে উৎপন্ন তাই অপ্সরা নাম। দেব এবং অসুর কোনপক্ষই এদের গ্রহণ করেন না; তাই স্বর্গের বিদ্যাধরীরূপে পরিগণিত। পৌরাণিক কিংবদন্তীগুলিতে এরা রূপৈশ্বর্যময়ী, সংগীত নৃত্য কুশলা বলে বর্ণিত। দেবতারা প্রতিদ্বন্দ্বী মুনি ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য এদের কাজে লাগাতেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরা মেনকা নিয়োজিত, তার ফলে শকুন্তলার জন্ম। অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা সমধিক প্রসিদ্ধ।

—বিশ্বকোষ | সাক্ষরতা প্রকাশন | পৃঃ—৭৮

১১, আম্রপালী বৈশালীর রাজোদ্যানের আম্রকানন পালকের পালিত কন্যা। অপরূপ সুন্দরী। আম্রপালী কারো গলায় বরমাল্য না দিয়ে রাজসভা নর্তকীর জীবন বেছে নেন।

৩ : মহামতি বিদুরের জন্ম

মহাভারতের প্রধানপুরুষদের অন্যতম ক্ষত্তা বিদুরের জন্ম হয়েছিল জননী সত্যবতীর জারজ পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের ঔরসজাত অজ্ঞাতনাম্নী এক দাসীর গর্ভে। সেই দাসীর শূদ্রত্ব মোচন করে দিয়েছিলেন মহর্ষি কিন্তু মহামতি বিদুরের কপালে শূদ্রত্বের টিকা সমুজ্জ্বল হয়ে থাকল ক্ষত্তা পরিচয়ে।

এদিক থেকে সত্যবতী সত্যিই অতি ভাগ্যবতী। মহারাজ শান্তনুর ধর্মপত্নী হতে পেরেছিলেন তিনি। হতে পেরেছিলেন রাজমাতা। সে যুগে কোনও শূদ্রা রমণীর পক্ষে এমন সম্মান লাভ ছিল নিতান্তই দুর্লভ। ঋষি পরাশর তাঁকে উপরিচর বসুর কন্যারূপে পরিচয় দিলেও সাধারণের কাছে তা ছিল অপরিজ্ঞাত। রাজা উপরিচরও মৎস্যগন্ধাকে গ্রহণ না করে ধীবরকে ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন—'কন্যেয়ং তে ভবত্বিতি' অর্থাৎ এই কন্যাটি তোমার হোক। কাজেই ঋষি পরাশরের উক্তি বা যুক্তি কোনটারই মূল্য থাকত না, যদিনা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যেত ইত্যবসরে। বৈদিকযুগে জাত-পাতের কড়াকড়ি ছিলনা তেমন। "যজুর্বেদে আর্য্যপুরুষ ও শূদ্র কন্যার অবৈধ প্রেমবন্ধন এবং উহার বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ শূদ্রপুরুষ ও আর্য্যকন্যার অবৈধ প্রণয়ও স্বীকৃত হইয়াছে।[১] বাজসনেয় সংহিতায় এ ধরনের ঘটনা স্বীকৃত হলেও কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে তা আবার অস্বীকার করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। বস্তুতঃ তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় পূর্বাবস্থার পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল ক্রমশঃ। মহাভারতের যুগে যদিও পাকা হয়ে গিয়েছিল শ্রেণী বা বর্ণ-বিভেদের বুনিয়াদ, প্রবল হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ; ধর্মশাস্ত্রগুলি শ্রুতি থেকে স্মৃতিতে, স্মৃতি থেকে সদাচারে এবং সদাচার ক্রমে কেন্দ্রীভূত হয়ে চলছিল লোকাচারে। তথাপি একথা সত্য যে সমাজ-ধর্ম যুগোপযোগী না হলে রাজন্যবর্গের তাঁবেদার পরগাছা শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে যেত নিঃসন্দেহে। ঋষি পরাশর তা জানতেন আর জানতেন বলেই বলতে পেরেছেন যে, "যুগে যুগে চ যে ধর্মাস্তেষু তেষু চ যে স্থিতাঃ। তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্য যুগরূপা হিতে দ্বিজাঃ" অস্যার্থ যুগভেদে যে ধর্ম যে যুগের জন্য বিহিত তা সেই ব্রাহ্মণ সেই যুগে প্রযুক্ত ধর্ম বলে প্রতিপালনে সমর্থ তাকে অধার্মিক বলে নিন্দা করা অনুচিত। কারণ সেই ব্রাহ্মণ সেই যুগের মূর্ত প্রতিমূর্ত্তি। যুগভেদের সমাজধর্ম মেনে নিয়ে-

ছিলেন পরাশর। ধর্মের হানি অন্তত ঘটেনি তাঁর দ্বারা। কেননা, সে যুক্তি মানে না, সে ধর্মও মানেনা—'যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে। ব্রাহ্মণরা খাঁটি আর্যরক্তবিশিষ্ট ছিলেন না সকলেই। পরাশরও ছিলেন না বলেই দৃঢ়তর অনুমান। কন্দর্পকান্তি ছিলনা তাঁর চেহারা এবং গাত্র বর্ণও ছিল সম্ভবতঃ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নতুবা তাঁর ঔরসজাত সন্তান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পরমাসুন্দরী মৎস্যগন্ধার গর্ভ থেকে কদাকার চেহারা নিয়ে জন্মাতেন না কখনই। মহর্ষি ব্যাসের যৌবনকালের বর্ণনাতেই আছে—তস্য কৃষ্ণস্য কপিলাং জটাং দীপ্তে চ লোচনে। বভ্রূনি চৈব শ্মশ্রূণি অর্থাৎ বাংলা করলে দাঁড়ায়—তাঁর গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, মাথায় কপিল বর্ণের জটা, চোখ দুটি উজ্জ্বল, মুখে পিঙ্গলবর্ণের গোঁফ-দাঁড়ি। অথচ শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয় চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য উভয়েই ছিলেন অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ।

পক্ষান্তরে সত্যবতীর দুর্ভাগ্য যে তাঁর সমাজানুমোদিত দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য কেউই বংশরক্ষা করে যেতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। বংশরক্ষার শেষতম উপায় হিসাবে বেছে নিতে হয়েছে 'নিয়োগ প্রথা'। নিয়োগ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল মহাভারতের যুগে। সে যুগে শুধু 'নিয়োগ প্রথা' (Junior Levirate) নয়, বহু স্বামিত্ব (polyandry) গ্রহণ, পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচলিত ছিল পাশাপাশি। পুত্রবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য ভীষ্মকেই প্রথম অনুরোধ করেছিলেন সত্যবতী কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণে সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব ছিলনা তাঁর পক্ষে। অতঃপর ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর কানীন পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকেই স্মরণ করলেন জননী সত্যবতী। ব্যাসদেব এসে হাজির হলেন এবং রাজী হলেন মায়ের কথায়। ব্যাসদেব ত আর ভীষ্মদেব নন যে জীবনে নারী সম্ভোগ করবেন না বলে স্থির প্রতিজ্ঞ! কিন্তু তাঁর বিকট চেহারা আর গায়ের উৎকট গন্ধে ভয়ে-বিতৃষ্ণায় চোখ বন্ধ করেছিলেন অম্বিকা। মাতৃ দোষেই নাকি ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ হয়ে জন্মাবার মূল কারণ। তবে এটা ভুল কারণ কিনা তা ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া হলপ করে বলা কঠিন। এ হেন অবস্থায় রমণকালে ভয়ে বিহ্বলা বা ধর্ষিতা রমণীদের সন্তানেরা যদি আনুপাতিক হারে অধিকসংখ্যায় অন্ধ হয়ে জন্মায় তাহলে না হয় এমন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অন্ধ পুরুষ বা রমণীর সন্তানদের ড্যাবডেবে দুটি চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় বাস্তবে। যাই হোক ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হয়ে জন্মাবার পর বিচিত্রবীর্যের প্রথমা পত্নী অম্বিকার গর্ভে দ্বিতীয়বার সন্তান

উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যাসদেবকে পুনর্নিয়োগ করেন সত্যবতী। নিরুপায় অম্বিকা আপন পোষাক আর অলঙ্কারে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের পরিবর্তে একজন দাসীকে পাঠালেন ব্যাসদেবের সেবায়। শূদ্রাণীর সেবা-পরিচর্যায় তুষ্ট হলেন মহর্ষি এবং উভয়ের পূর্ণ মিলনের ফলে জন্ম হোল মহামতি বিদুরের। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে পরিচিত হলেন বিদুর। তবু তিনি অভিজাত রমণীর গর্ভজাত সন্তানের মর্যাদা পেলেন না সমাজে। দাসীপুত্র বলেই তিনি ক্ষত্তা বিদুব নামে পরিচিত হলেন সকলের কাছে। মিলনের আনন্দে শূদ্রাণীর দাসীত্বও মোচন করে দিয়েছিলেন ব্যাসদেব। তথাপি শূদ্রের গন্ধ গেলনা তার সন্তানের গা থেকে। শূদ্রত্ব ছিল এমনই এক দুরপনেয় সামাজিক অভিশাপ।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, বিদুর কি জ্ঞানে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র হলেন? অম্বিকার দাসীকে ত আর বিয়ে করেননি বিচিত্রবীর্য! এক্ষেত্রে ব্যাসের পুত্র হিসাবে পরিচিত হওয়া উচিত ছিল বিদুরের যেমন ব্যাস নিজে পরিচিত হয়েছেন পরাশর পুত্র হিসাবে। যদি তিনি বিচিত্রবীর্যের পুত্ররূপে পরিগণিতই হলেন তবে তাঁর রাজ্য লাভে বাধা কোথায়? পাণ্ডুর পরেই তার রাজা হবার কথা। কিন্তু যেহেতু তিনি 'পারসব' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান সেহেতু রাজ্যলাভে বঞ্চিত হলেন বিদুর। 'পারসব অর্থে ক্ষত্তা বলে পরিচিত হয়ে রইলেন মহাভারতে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে ক্ষত্তা অর্থে "শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়া জাত বর্ণসংকর বিশেষ".[২] জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানে "বৈশ্যা কিংবা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত পুত্র"।[৩] অভিধানের অর্থানুযায়ী বিদুরকে শূদ্রের ঔরসজাত সন্তান বলা যায়না কখনও। প্রকৃতপক্ষে ব্যাসের পুত্র হিসাবে বিদুর হলেন ব্রাহ্মণ। চলন্তিকা অভিধানে ক্ষত্তা অর্থে 'দাসীপুত্র' বলে ছেড়ে দিয়েছেন রাজশেখর বসু।

বিদুরের পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন স্বয়ং ধর্মরাজ অনী মাণ্ডব্য মুনির শাপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মুনি-ঋষিদের শাপপ্রদান ও বরদান ছিল এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। অথচ "শাপ কখনও ফিরিয়ে নেওয়া যায়না। যত অযৌক্তিক যত অন্যায়ই হোক, শাপ দেওয়ার পর শাপদাতা যতই উপলব্ধি করুন যে অন্যায় ও অবিচার করা হয়ে গেছে, একবার শাপ হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে তার একটুও এদিক ওদিক হওয়া সম্ভব নয়। শাপের এই লক্ষণটি পৌরাণিক সাহিত্যে ব্যতিক্রমহীন। তেমনি ব্যতিক্রমহীন অপর আর একটি লক্ষণ। তা হল এই যে শাপদাতা নিজেই

শাপমুক্তির উপায় দেখিয়ে দিতে পারেন। শাপের অপনয়ন সম্ভব না হলেও খানিকটা ক্ষতিপূরণস্বরূপ এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যা বরদানের স্বরূপ।[৪] বিদুরের জন্মবৃত্তান্তের পশ্চাতে শাপ প্রদানের উপকাহিনীটি নিম্নরূপ: বেদবিৎ মাহাত্ম্যশালী ও মহাযশস্বী প্রাচীন অনীমাণ্ডব্য মুনি চোর না হয়েও রাজা তাকে চোর সাব্যস্ত করে শূলে দেন। তারপর মহাযশস্বী সুপ্রসিদ্ধ সেই মহর্ষি অনীমাণ্ডব্য ধর্মদেবকে ডেকে বললেন—"ধর্মরাজ! আমি বাল্যকালের চঞ্চলতা-বশতঃ শরদ্বারা (নলখাগড়া দিয়া) একটা ক্ষুদ্র পাখীকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম; আমার জীবনে সেই একমাত্র পাপই আমার স্মরণে পড়ে, অন্য পাপ স্মরণে পড়ে না। ধর্মরাজ! সেই পাপ অপেক্ষা সহস্রগুণ এবং অতুলনীয় তপস্যা আমার সেই পাপটুকু নষ্ট করিতে পারে নাই কেন? যাহা হউক, সমস্ত প্রাণিবধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণবধ গুরুতর পাপজনক, সুতরাং তুমি সেই পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে বলিয়া তুমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে।"[৫] অনীমাণ্ডব্যের সেই শাপে এবং সেই পাপে ধর্মরাজ বিদুররূপে জ্ঞানী ও ধার্মিক হয়ে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন পৃথিবীতে।

দেখা যাচ্ছে, মহাভারতের যুগে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করাই ছিল পাপের শাস্তি স্বরূপ। ব্রাহ্মণের এমনই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যে তাঁর অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাননি স্বয়ং ধর্মরাজও। বৈদিকযুগের পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ বিরচিত ধর্মশাস্ত্রগুলিতে শূদ্রের প্রতি যে মানবতাবিরোধী অবিচার করা হয়েছে এ তারই একটি নমুনামাত্র। বেদে অন্ততঃ এমনটি দেখা যায়না। বেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে দাসীপুত্র কবষ আইলুস্ ও উষিজ, দাসীপুত্র কক্ষিষত এবং বৎস্য ঋষি যাকে শূদ্রপুত্র মনে করা হয়ে থাকে—এঁরা সেই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রমাণ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কণ্বমুনিকেও বলা হয়ে থাকে শূদ্রপুত্র। ঋষি পরাশর এবং তস্যপুত্র ব্যাসদেবও এর ব্যতিক্রম নন্। জবালা পুত্র সত্যকামও এ প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণীয়। বৈদিকযুগে জাতিভেদ ত দূরের কথা, শ্রেণীভেদ ছিল কিনা সন্দেহ! সেকালে বংশ বা পেশা দ্বারা নির্দ্ধারিত হ'ত না লোকের সামাজিক পদমর্যাদা। ঋকবেদের একটি বিখ্যাত শ্লোকে রয়েছে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ: "আমি একজন চারণ বা স্তোত্ররচনাকারী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আমার পুত্র হইতেছে ভীষক আমার কন্যা জাঁতা পিষে। বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিয়া ধন কামনা করিয়া আমরা গরুর ন্যায় অপরের অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করি।"[৬] বৌধায়ন ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিবাহের সমর্থন রয়েছে। বৌদ্ধযুগে সূত্রপাত হয়েছে জাতি প্রথার। বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিপত্তি। এ সময়ে ব্রাহ্মণদের

'হীন-জাচ্চ' অর্থাৎ হীন জাতি বলে ঘৃণা করা হত। মহাভারতের যুগে আবার প্রবল হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যবাদ। কঠোর হয় জাতিভেদ প্রথা।[৭]

মহাভারতে স্পষ্ট চোখে পড়ে কুলগত বৈরী ভাব (bloodfeud) চোখে পড়ে বর্ণ বিভাগের কঠোরতা। গোধর্মা তুল্য নিয়োগ প্রথাও চোখে পড়ে সন্তান উৎপাদনে। তথাপি ধর্মরাজ্য (Theocracy) সংস্থাপনে এবং সামন্ততন্ত্র (feudalism) প্রতিষ্ঠান চোখে পড়ে সংগঠিত অনুষ্ঠান। চোখে পড়ে ধর্মের নামে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসহযোগিতার প্রচেষ্টা। ইতিপূর্বে শূদ্রদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই সম্ভবতঃ ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের চিন্তাবীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য বাদীদের মনে। ধর্মরাজ্য বলতে—সর্বজাতি-বর্ণ-ধর্ম সমন্বয়ে এক রাষ্ট্রের অধীন মানুষের সুখে বসবাসের পরিকল্পনা। এই ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা সার্থক না হলেও তার মূল্য ছিল অপরিসীম। বিদুর ছিলেন এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান পুরুষ। শূদ্রযোনিতে জন্ম তাঁর কর্মজীবনে প্রতিবন্ধক হয়নি কখনও।

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১. ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত—পৃঃ—১২৫
২. বঙ্গীয় শব্দকোষ—প্রথম খণ্ড—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ—৭০২
৩. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—প্রথম ভাগ—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস—পৃঃ—৫৯৪
৪. ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন—অশোক রুদ্র।
'ক্রোধ ও শাপ প্রদান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা—৬৩
৫. মহাভারতম্—আদিপর্ব—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত অনুবাদ।
৬. ঋকবেদ—(৯, ১১১, ৩)
৭. "That caste existed before 300 B.C., and it is reasonable to believe that castes, separated from one another by rules of ceremonial purity, as they now are, were in existence some centuries earlier. I do not find any indication of the existence of caste in Rigvedic times."

—THE OXFORD HISTORY OF INDIA
4th Edition (By the late Vincent A. Smith)
See Page—64—Chapter—CASVI

৪ : যুধিষ্ঠির

মহাভারতে সত্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ধর্মের প্রতিমূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন মহারাজা যুধিষ্ঠির। ইনি কুন্তীর গর্ভজাত দ্বিতীয় এবং পাণ্ডুর প্রথম ক্ষেত্রজ সন্তান। তাঁর জন্মদাতা পিতা হলেন ধর্মরাজ। এ কারণে লোকে কথায় বলে— 'ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির'। পাণ্ডুর পরামর্শ ও অনুমতিক্রমে পতিপরায়না কুন্তী সন্তানোৎপাদনে আহ্বান করেছিলেন সর্বদেবাগ্রগণ্য ধর্মকে। "কিন্তু ধর্ম, যিনি কুন্তীকে তাঁর প্রথম 'বৈধ' পুত্র দান ক'রে গেলেন—তাঁর কোনো মূর্তি আমরা ভাবতে পারিনা, কোন ইতিহাস স্মরণে আসেনা আমাদের।"[১]

সত্যিই তো মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কে এই ধর্মরাজ? ধর্মশাস্ত্রীয় মতে তাঁর কোনো চেহারা আমাদের চোখে স্পষ্ট নয় আজও। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, শূন্যমূর্ত্তি ধর্মঠাকুর এবং শূন্যাকৃতি ধর্মশিলা শূন্যবাদী বৌদ্ধদের প্রভাবজাত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নয় কোনমতেই। ধর্মপুরাণ ও ধর্মসাহিত্যে শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্ব নতুন কিছু আবিষ্কার নয়। শূন্যবাদী তত্ত্বের মূল রয়েছে ঋগ্বেদেই।[২]

হিন্দুপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে মিল রয়েছে বৌদ্ধজাত শূন্যপুরাণের। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, আর্য ও আর্যেতর জাতির সংমিশ্রণে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি। কাজেই, হিন্দুপুরাণগুলির জন্ম আর্যদের আগমনের অনেক পরে। আবার শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে মিল রয়েছে ঋগ্বেদে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের। ভারতে বৌদ্ধ প্রভাবের ইতিহাস কম করে বারশো বছরের। খ্রীষ্টের জন্মের ছ'শো বছর আগের থেকে খ্রীষ্টীয় ছ'শো বছরের পর পর্যন্ত। মাঝখানে চতুর্থ শতকে গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটলেও বৌদ্ধদের শক্তি ও সংগঠন ভেঙে পড়েনি তেমন।[৩]

শূন্যপুরাণে সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনার নমুনা নিম্নরূপ :—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসি নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥

নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পুজিবাক দেহ।
মহাসুন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥

ধর্মপূজা বিধানে ধর্ম হলেন ব্রহ্মরূপ নিরঞ্জন। তিনিই আবার উপনিষদের সর্বশক্তিমান অনাদি অনন্ত নিরাকার ব্রহ্ম। ধর্মঠাকুরে অনার্য প্রভাব সর্বজন-বিদিত। শিবের গাজনের সাথে ধর্মের গাজন মূলতঃ অভিন্ন। আবার ধর্মশিলার সঙ্গে বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্য নয় আদৌ। তবে যমরাজের সঙ্গে ধর্মরাজের মিল যেন সব চাইতে বেশি।

পুরাণে যমের আর এক নাম ধর্মরাজ। তিনি মৃত্যুলোকের প্রথম বাসিন্দা। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তাঁরই মৃত্যু হয়েছিল প্রথম। যমই মৃত্যুর দেবতা ও প্রেতলোকের অধীশ্বর। তিনি পাপ-পুণ্যের বিচারক। তিনিই পাপীর শাস্তি দাতা এবং পুণ্যের পুরস্কার প্রদাতা। যমের প্রহরী দুই কুকুর যমদূত বলে পরিকল্পিত। মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী কুকুর যে স্বয়ং ধর্ম সেই কল্পনার সূত্রপাত এখান থেকেই অনুসৃত। তবে ঋগ্বেদের যম ও পৌরাণিক যম এক নন্ কখনই। ঋগ্বেদের যম পিতৃলোকের অধিকর্তা, পুরাণের যম নরকের। পৌরাণিক যম আয়ুহীনের মৃত্যুদাতা ও পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা। ন্যায়ধর্মের বিচারক বলেই তিনি ধর্মরাজ।[৪]

ধর্মের সঙ্গে মিল রয়েছে বৈদিক দেবতা বরুণের।

মিল রয়েছে হিন্দুপুরাণের ধর্মরাজ যমের সঙ্গে বৌদ্ধদেবতা ধর্মপালের। বস্তুতঃ উভয়দেবতা একই দেবতার প্রকারভেদ মাত্র। সনধর্মা যম ও ধর্ম উভয়েই আবার সূর্যপুত্র। ধর্মপূজা বিধানে শূন্যমূর্ত্তি ধর্মের স্তুতিতে আছে—'শূন্যমার্গে স্থিতং নিত্যং শূন্যদেব দিবাকরম্।' আসলে ধর্মরাজ এক মিশ্রিত দেবতা। তাঁর নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই। অরুণ-বরুণ-ব্রহ্মাণ-বিষ্ণু-শিব প্রমুখ দেবসত্তার মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর চেহারায় ও চরিত্রে। কাজেই আমরা বুঝতে পারিনা, কেন এমন গৌণ দেবতাকে রাজর্ষি পাণ্ডু অগৌণে দেবশ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়ে বলতে পারলেন যে, "সুন্দরি। দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন, তাঁহাকেই আহ্বান কর।"[৫] কুন্তী অমনি বললেন—যে আজ্ঞা! ব্যাপারটা সাজানো বলেই সন্দেহ হয় আমাদের।

মহাভারতে পাণ্ডুর প্রথম পুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্মকথা অতি সংক্ষেপে অর্থাৎ আটটি

সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্জুনের জন্ম নিয়ে যতটা ঘটাপটা হ'লো যুধিষ্ঠিরের জন্মোৎসবে তার কিছুই ঘটলো না কেন? কেমন যেন একটা রাখ-ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার। আমরা একবারই ছদ্মবেশী ধর্মের আত্মপরিচয় পাই মহাভারতের বনপর্বে। বকরূপী ধর্ম সুদৃশ্য সরোবর তীরে নিশ্চল নিশ্চুপ দণ্ডায়মান। জল পানার্থী পঞ্চপাণ্ডবের কাছে ধর্মবকের প্রথম ঘোষণাই ছিল নিষেধাজ্ঞা: 'সাহস কোরো না,—মা সাহসং কার্ষীম।' চার ভাই সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় জলপান অন্তে বরণ করলেন মৃত্যুকে। অবশেষে যুধিষ্ঠিরও শুনলেন সেই নিষেধাজ্ঞা—মাসাহসং কার্ষীম। অবাধ্য হলেন না তিনি। বরং মৎস্যশৈবালভোজী বককে প্রশ্ন করলেন যুধিষ্ঠির—"আপনি কোন্ দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার ভ্রাতাকে আপনি নিপাতিত করেছেন, আপনার অভিপ্রায় কি তা বুঝতে পারছিনা, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কৌতূহলও হচ্ছে। ভগবান, আপনি কি?"[৬] জবাবে জানতে পারলেন যুধিষ্ঠির—'অহং তে জনকস্তাত ধর্মো বীরঃ। সনাতনঃ।' অস্যার্থ—বৎস বীর, আমি তোমার পিতা, আমি ধর্ম, আমি সনাতন।

অদৃশ্য পুরুষের কণ্ঠস্বরে পিতৃপরিচয় পেয়েছেন যুধিষ্ঠির কিন্তু পিতার স্বরূপ দেখতে পাননি তিনি। সরোবরে শান্তস্থির ধর্মবক নিশ্চিতই ধর্মের ছদ্মরূপ। নিরাকার ধর্মরাজের সাকার মূর্ত্তির পরিচয় পেয়েছি আমরা মহাভারতে। অনীমাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে শূদ্রযোনিতে জন্মেছিলেন তিনি। ব্যাসের ঔরসজাত হলেও ইনি বিচিত্রবীর্যের পুত্র বিদুর নামে খ্যাত। তাহলে কি বিদুরই যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয় লেখিকা ইরাবতী কার্ভে যে বিশ্লেষণী বিষয় দাখিল করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। তিনি অবশ্য এর প্রামাণিকতা দাবী করেননি কোথাও। তথাপি তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা অস্বীকার করবার জো নেই। শ্রীমতী কার্ভের প্রথম যুক্তি এই যে, বিদুর সম্পর্কে কুন্তীর দেবর। নিয়োগের পক্ষে দেবর সর্বোত্তম, সর্বশেষ উপযুক্ত এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় যুক্তি, বিদুর স্বয়ং শাপগ্রস্ত ধর্মরাজ। মুনির শাপে শূদ্রাণীর গর্ভে তার জন্ম। তৃতীয় যুক্তি, মৃত্যুর পূর্বে বিদুর তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তি ও আত্মাকে সঞ্চালিত করে দিয়ে যান যুধিষ্ঠিরের দেহে। মুমূর্ষু পিতার পক্ষে পুত্রের প্রতি আচরণীয় একটি উপনিষদুক্ত সংস্কার এবং চতুর্থ যুক্তিটিই তাঁর সব চাইতে জোরালো এই কারণে যে, বিদুরের মৃত্যুর পর ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে মহাত্মা বিদুরই 'যোগবলে' উৎপাদন করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। একথা বলার পরেই ব্যাস আবার বলেছেন যে, যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর, তিনিই যুধিষ্ঠির।'[৭]

প্রখ্যাত লেখক ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু শ্রীমতী কার্ভের যুক্তিকে নিছক অনুমান বলে এড়িয়ে যেতে গিয়েও এড়িয়ে যেতে পারেননি একেবারে। তিনি স্বীকার করেছেনযে, "শ্রীমতী কার্ভের যুক্তিগুলিও ভেবে দেখবার মতো।" এও স্বীকার করেছেন যে, "পরাশর ও ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিরা, এমনকি সূর্যাদি দেবগণও যখন প্রকৃতিসম্মত যৌন উপায়েই নারীর গর্ভে সন্তানের সঞ্চার করেছিলেন, তখন হঠাৎ বিদুর কেন যোগবল ব্যবহার করবেন তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। তাছাড়া, পিতা ও পুত্র এক ব্যক্তি হতে পারেন না, একথাও স্পষ্ট। ব্যাসের এই কথাগুলো আমাদের কানে হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে..."[৮]

বস্তুতঃ বুদ্ধদেব বাবু অনেক কথাই বলেছেন আসল কথাটি না বলে। তিনি সযত্নে যুক্তি-তর্কের পথ পরিহার করে অকারণ আবেগকেই আশ্রয় করেছেন শেষ পর্যন্ত। একথা অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি যে, "পুঁথি খুঁড়ে খুঁড়ে অনুপুঙ্খ উদ্ধারের কোন প্রয়োজন নেই, অন্য এক জাজ্জ্বল্যমান কারণে বিদুর-যুধিষ্ঠিরকে পিতা-পুত্ররূপে গ্রহণ করতে আমরা কিছুতেই পারিনা। কেননা যুধিষ্ঠিরের পিতৃপদ থেকে ধর্মকে বিচ্যুত করলে মহাভারতের একটি ভিত্তি-প্রস্তর সরিয়ে নেওয়া হয়, ধ্বসে পড়ে সেই বিরাট অট্টালিকা.. যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র হলে সমগ্র মহাভারতকে হতে হ'তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্রন্থ—এমন বহু অংশ স্থান পেতে পারতো না যার উপর আমাদের পরিচিত মহাভারতের মহনীয়তা নির্ভর করে আছে।"[৯]

ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে, যে মৃদু অভিযোগ তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পর্কে তুলেছেন ব্যুমেরাং হয়ে তাই ঘুরে গেছে তাঁরই কাছে। আশ্রমবাসিক পর্বে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রবধূ কুন্তীকে জানিয়েছেন যে, পাঁচ উপায়ে দেবতারা প্রজনন করে থাকেন: সংকল্প, দৃষ্টি, বাক্, স্পর্শ ও সংঘর্ষ। 'সংঘর্ষ' অর্থ স্পষ্টতই ইন্দ্রিয় মিলন—টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেছেন—'সংঘর্ষেণ রত্যা'—কিন্তু কালীপ্রসন্নে আছে 'প্রীতি উৎপাদন'। অত্রস্থলি মন্তব্য করেছেন বুদ্ধদেব বাবু—"পাথুরেঘাটার বীর বালক কালী সিঙ্গিও পাণ্ডুতাসাধক ব্রাহ্ম সংক্রমণ কাটাতে পারেননি।"[১০] কাটাতে পারেননি বুদ্ধদেববাবু নিজেও। নরনারীর যৌন-সংঘর্ষ ছাড়া যেখানে সন্তান উৎপাদন কার্যত অসম্ভব সেখানে কুন্তীর পক্ষে অবয়বহীন ধর্মদেবতাকে আহ্বান করার কি সার্থকতা থাকতে পারে? বাস্তবতার দিক থেকে বরং দেবর বিদুরকে নিয়োগ করাই ছিল তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত। একথা স্বীকার করতে বাধা কোথায়? এতে মহাভারতের ভিত্তি-প্রস্তর খসে পড়বারও কোন কারণ দেখতে পাইনে। নতুন

করে মহাভারত রচনার প্রশ্ন ওঠেনা আর। যা আছে তা আছে। প্রশ্ন শুধু, চরিত্র সৃষ্টির পেছনে কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করেছে চরিত্রকারের? কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থ কাজ করেছে কি-না। চিরাচরিত প্রথার বাইরে দাঁড়িয়ে মহাভারতের মত মহাকাব্যের যুগোপযোগী বিশ্লেষণের দ্বারা সত্যানুসন্ধান দোষের হতে পারেনা। সাহিত্যের মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়নই সর্বকালের সুস্থ চিন্তার শ্রেষ্ঠ পন্থা। কালের কস্টিপাথরে তার যথার্থ বিচার।

সঙ্গত কারণে অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, রাজর্ষি পাণ্ডু ছিলেন পুরুষত্বহীন। বংশরক্ষার দায়িত্ব পালন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সে কারণে তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তদীয় ধর্মপত্নী কুন্তী ও মাদ্রীকে অনুমতি দিয়েছিলেন পরপুরুষ নিয়োগে। অবশ্য মহাভারতীয় রীত্যানুসারে পাণ্ডুর এই পুরুষত্বহীনতাকে আড়াল দিতে অবতারণা করা হয়েছে পূর্বজন্মের এক অভিশাপ কাহিনীর।[১১] অবতারণা করা হয়েছে যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত পিতৃপদে অধিষ্ঠিত ক্ষত্তা বিদুরের স্বকীয় সত্তাকে আড়াল দিতে ধর্মরাজের আবির্ভাবকে। কেন এই অন্তরাল সৃষ্টি? কার বা কিসের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে এতে? প্রশ্ন উঠতে পারে ধার্মিক বিদুর কেন গোপন করে গেলেন আপন পিতৃত্বকে? সারা মহাভারতে কুন্তীই বা কেন মুখ খুললেন না একটিবারও? তিনি কি তাঁর কুমারী জীবনের কলঙ্ককথা প্রকাশ করেননি জারজ সন্তান কর্ণের কাছে? তবে কেন যুধিষ্ঠিরের বেলায় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলেন তিনি? প্রসঙ্গটি সরাসরি উত্থাপন করেছেন বুদ্ধদেববাবু: "কুন্তীর অন্য তিনপুত্র দেববীজোদ্ভুত—নগণ্য মাদ্রীতনয়েরাও তাই—এই অবস্থায় যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির যদি মনুষ্যপুত্র হতেন, তাহলে সেটা হ'তো সমগ্র মহাভারতের পক্ষে একটি দূরপ্রসারী ইঙ্গিতপূর্ণ প্রধান ঘটনা—কাহিনী বিন্যাসের দিক থেকে সেটাকে গোপন রাখা কোন মতেই সম্ভব হ'তো না, ধরে নেয়া যায় কর্ণের জন্মকথার মতোই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত হ'তো বহুবার, একবার হয়তো কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম।"[১২]

বুদ্ধদেববাবু নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হচ্ছে যে, আবহমানকালের প্রথাবদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়েই ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এবং যে কারণে তাঁকে বলতে হয়েছে, "আমাদের মেনে নিতে হবে যে যুধিষ্ঠিরের পিতা এক দেবতা, এবং তাঁর নাম ধর্ম—হতে পারে তিনি সংশয়াচ্ছন্ন ও রহস্যময়, যমদেবও মানবিক ধর্মনীতির মিশ্রণে রচিত এক অনির্দেশ্য সত্তা—তবু দেবতা তাতে সন্দেহ নেই, পুত্র বিষয়ে সস্নেহ ও পরীক্ষণশীল, তাতে

সন্দেহ নেই। 'অহংতে জনকস্তাত'—তাঁর মুখের এই কথাটি অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"[১৩]

এতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধদেব বসুও কি অবাস্তব দানিকেন তত্ত্বে বিশ্বাসী? নতুবা দেবতার প্রতি সহসা অগাধ ভক্তি-প্রীতি সহকারে এমন তদ্গত চিত্ত হলেন কেন তিনি?[১৪] সন্দেহ হয়, সত্যসন্ধ ব্যাসদেব অন্ধ ছিলেন নাতো! নচেৎ—'যো হি ধর্মঃ স বিদুরো বিদুরো যঃ স পাণ্ডবঃ'—এমন চরম বা নির্মম সত্য প্রকাশের পরেও তাঁকে কিরূপে অমান্য করে যেতে সাহসী হলেন বুদ্ধদেববাবু! ঐতিহ্যবাহী মহাকাব্যের সুরম্য ইমারৎ রক্ষার দায় তাঁর একার বর্তালো কেন জানিনা। মহাভারত রচয়িতা স্বয়ং ব্যাসদেবও তো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। তদানীন্তনকালের সমাজ ব্যবস্থায় তাঁকে যতটা রেখে-ঢেকে কথা বলতে হয়েছে আজকের দিনে অন্ততঃ সে দায়িত্ব পালনের দায় নেই কারো। আমরা নেহাতই ভারতকথার সার সমুদ্র মন্থন করে ইতিহাসের নির্যাসটুকু নেবার পক্ষপাতী। তাই কোনপ্রকার মোহময় কাব্যিক ছলনার চাইতে কঠিন সত্যের আলোক-অবগাহন আমাদের পক্ষে একান্ত কাম্য।

অতঃপর যুধিষ্ঠিরের জন্মকথায় জাতকের প্রকৃত জনক-জননীর অর্থাৎ বিদুর-কুন্তীর মানসিক ভারসাম্য অনুধাবনই এখন আমাদের শেষতম লক্ষ্য। মহাভারতের পাতায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি রেখে বিদুর-কুন্তী চরিত্রদ্বয়ের পূর্বাপর আচরণ বিশ্লেষণ করলে গভীর গোপন এক প্রণয় সম্পর্ক চোখে পড়ে সহজেই। পাণ্ডুর পুরুষত্বহীনতা এবং অকাল মৃত্যুর কারণে উভয়ের প্রণয় সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও মধুর হইয়াছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁদের চরিত্রে কোথাও অসংযমের পরিচয় নেই বিন্দুমাত্র। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর বিধবা রাজ্ঞী কুন্তী সর্বতোভাবে সর্বথা নির্ভর করেছেন পরম প্রাজ্ঞ দেবর বিদুরের উপর। এ কি শুধু প্রাজ্ঞ বিদুরের প্রজ্ঞার প্রতি কুন্তীর একান্ত নির্ভরশীলতা, না কি তাঁর গোপন-গভীর প্রেম মাধুর্যের প্রকৃত পরিচয়? প্রশ্নটি অবশ্যই আমাদের ভেবে দেখবার মতো। কেননা ন্যায়ধর্মের প্রতিমূর্তি পিতামহ ভীষ্ম বা শাস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্যের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ রাজসভায় আসীন থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডুপুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণে বিদুরই ছিলেন কুন্তীর পরামর্শদাতা ও পরম ভরসার স্থল। ভারত কথায় বর্ণিত নানা ঘটনা থেকেই এ-তথ্য জ্ঞাত হয়েছি আমরা।[১৫] পাণ্ডবদের বনবাসকাল ও অজ্ঞাতবাসের বছর বিদুর-গৃহে ছিলেন কুন্তী। বনগমনের দিন যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে বিদুর বলেছিলেন—"আর্যা কুন্তী বৃদ্ধা ও সুখভোগে অভ্যস্তা তিনি সসম্মানে আমার গৃহেই বাস করবেন।"[১৬]

যুধিষ্ঠির তাঁর আজ্ঞা অবহেলা করেননি কখনও। প্রত্যুত্তরে বলেছেন—"আপনি আমাদের পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।"[১৭] শুধু এই এক বারই নয়, আরও বহুবার কুন্তী ও পাণ্ডবগণের জন্য প্রকাশ পেয়েছে বিদুরের উৎকণ্ঠা ও আকুলতা। বারণাবত যাত্রার প্রাক্কালে দুর্যোধনের অভিসন্ধি জানতে পেরে বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় সর্বসমক্ষে সাবধান করে দিয়েছিলেন পুত্র যুধিষ্ঠিরকে। বিদুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ম্লেচ্ছভাষা জানতেন। বিদুর বললেন—"শত্রুর অভিসন্ধি যে জানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয়। অগ্নিতে শুষ্কবন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানুষ শজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে বাঁচাতে পারে। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বুঝেছি।

পথে যেতে যেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, বিদুর তোমাকে অবোধ্য ভাষায় কি বললেন, আর তুমিও বুঝেছি বললে, এর অর্থ কি? যুধিষ্ঠির বললেন, বিদুরের কথার অর্থ—আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল পথই যেন আমরা চিনে রাখি।"[১৮] বিদুরই দক্ষ সুড়ঙ্গ খননকারী পাঠিয়েছিলেন বারণাবতে। এসবই কুন্তীর প্রতি গোপন প্রণয়ের স্পষ্ট চিত্র নিঃসন্দেহে। অথচ নায়ক-নায়িকার পক্ষ থেকে এমন গভীর প্রণয় সম্পর্কের কোনও বহিপ্র্রকাশ নেই কেন আপাতদৃষ্টিতে তা খুবই আশ্চর্যের বিষয় মনে হতে পারে আমাদের। অবশ্য একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখা যাবে ঘটনার মূলে আছে সেই জন্মবৃত্তান্ত। যদিও বুদ্ধদেববাবু বলেছেন যে, 'কুন্তীর অন্য তিন পুত্র দেববীজোদ্ভূত—নগণ্য মাদ্রী তনয়েরাও তাই—কিন্তু আমাদের মতে কুন্তীর কিংবা মাদ্রীর কোনো সন্তানই দেববীজোদ্ভূত ছিলনা সকলই ছিল মনুষ্যবীজসম্ভূত। সামাজিক দিক থেকে পিতৃ-পরিচয় প্রকাশে ঘোরতর বাধা থাকায় দেবতার সন্তান বলে পরিচিত ছিল তারা। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও যুধিষ্ঠিরের সঠিক জন্ম পরিচয় প্রকাশে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল রাজনৈতিক।

আমরা জানি, বিচিত্রবীর্যের পুত্র হিসাবে পরিগণিত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যলাভের অধিকারী ছিলেন না বিদুর। কেননা তিনি ছিলেন 'পারসব'। 'পারসব' অর্থে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত সন্তান। সে যুগে বহু মহাজনেরই কপালে ছিল বর্ণসংকরের ছাপ। তবে শূদ্রের সংস্পর্শ ছিল পরিত্যাজ্য। অতএব বিদুর-কুন্তীর গভীর সংযোগ সম্প্রচারিত হলে কুন্তীর ভাবমূর্তি (image) নষ্ট হয়ে যেত শুধু তাই

নয় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সিংহাসন প্রাপ্তির কোনও প্রশ্নই উঠত না অতঃপর। নৈতিক কারণে রাজপদের দাবী খারিজ হয়ে যেত তার। এ-সত্য খুব ভালভাবেই জানতেন বলে যুধিষ্ঠিরের সঠিক জন্ম পরিচয় সংগোপন রেখেছিলেন বিদুর-কুন্তী। এক্ষেত্রে তাঁদের সংযম সম্যক প্রশংসিত হবার যোগ্য। বিশেষতঃ কুন্তীর ধৈর্য তাঁর চাতুর্যেরই নামান্তর। সামান্যতম চাঞ্চল্য প্রকাশে আকৈশোর লালিত রাজমাতা হবার স্বপ্ন তাঁর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত চিরতরে। নৈতিক বলেই সিংহাসন অধিকার করতেন দুর্যোধন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রয়োজন হ'তো না আর। কিন্তু সে সুযোগ না থাকায় শেষপর্যন্ত সদর্পে ঘোষণা করেছেন তিনি— 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।' পাণ্ডবগণের জন্মপরিচয়[১৯] জানেন বলে দুর্যোধন যে পণ্ডিতম্মন্য ভাব দেখিয়েছেন তা যথার্থ নয়। খাঁটি খবর ছিলনা তার কাছে। বুদ্ধদেববাবু যে বলেছেন—"ধরে নেয়া যায় কর্ণের জন্মকথার মতোই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত হতো বহুবার। একবার হয়তো কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম।"—এটা আশা করা বাতুলতা। কেননা কর্ণের জন্ম পরিচয় পাঠক হিসাবে আমরা অগ্রিম জানতে পেলেও তা বহু কাঙ্ক্ষিত নয় কখনোই এবং মহাভারতের চরিত্রগুলির পক্ষে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হবার আগে পর্যন্ত তা জানা সম্ভব ছিলনা আদৌ। একমাত্র কর্ণ পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিলে তাঁর জন্মরহস্য উন্মোচিত হ'তো অবশ্যই। কুন্তীর প্রস্তাবে কর্ণ কিছুটা নিমরাজী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর বহুদিনের চাপা আবেগ সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ায় মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে সম্ভাবনাময় মুহূর্তেই। জননী কুন্তী যে-মুহূর্তে কর্ণের সুমুখে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের টোপ ফেলেছেন সেই মুহূর্তে বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে কর্ণের মন। তিক্তকণ্ঠে তখনই জবাব দিয়েছে সে—

"সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃ স্নেহ পাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস।"[২০]

—যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের মৃত্যুতে কুন্তীর ভাবমূর্তি রক্ষা পেয়েছে বরং। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বেলায় তাঁর জন্মসত্য প্রকাশ পেলে ক্ষতি হ'তো পাণ্ডবকুলের সকলের এবং বিদুরের। রাজমাতার পরিবর্তে কুন্তী হতেন এক কলঙ্কিনী সাধারণ রমণী; পদমর্যাদায় পাণ্ডবগণ হতেন বিদুর বা সঞ্জয়ের মতই অবনত। সব চাইতে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াত মহাপ্রাজ্ঞ মহামন্ত্রী পরমধার্মিকপ্রবর বিদুরের যিনি কথায় কথায় 'সুমন্দ বুদ্ধি' বলে নিন্দা করতেন দুর্যোধনের। প্রায়শই জোর গলায় বলতেন তিনি—'আমি তোমার মোসাহেবের কাজ করতে পারিব না। মন্ত্রী তোমার সকল অভিপ্রায়েরই অনুমোদন করিবেন—ইহাই যদি মনে কর,

তবে স্ত্রীলোক, জড, পঙ্গু প্রভৃতিকে মন্ত্রিত্বে বরণ কর।'[২১] নিঃসন্দেহে বিদুর বিতাড়িত হতেন রাজসভা থেকে। কিন্তু কোনও কিছুরই আর দরকার হয়নি। ভেঙ্গে পড়েনি মহাভারতের সুরম্য অট্টালিকা। ধর্মপুত্তুরের জন্মসত্য প্রকাশিত না হওয়ায় রক্ষা পেয়েছে কুল-মান-সিংহাসন। অব্যাহত রয়েছে মহান্ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বহমান পুণ্যধারা!

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১. মহাভারতের কথ—বুদ্ধদেব বসু—পৃষ্ঠা—১৭

২. "আসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নং ভঃ কিমাসাদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীমৃতং ন তর্হিন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতর।
অসাদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কি চনাস॥
তম আসীত্তমসা গূহমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনার্ভপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

—ঋগ্বেদ—১০—১২৯—১—৪

বঙ্গানুবাদ: তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিলনা।
পৃথিবীও ছিলনা, অতি বিস্তার আকাশও ছিলনা। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল?
তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিলনা, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

২. সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।
সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল।
দ্রষ্টব্য: বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—পৃষ্ঠা—৩

৩. ধর্মাধর্মবিধানজ্ঞ সর্বধর্ম প্রবর্তক।
ত্বমেব জগতো নাথঃ প্রজসংযমনো যমঃ॥
কর্মণামনুরূপেণ সম্পাদয়সে প্রজাঃ।
তস্মাত্বৈ প্রোচ্যসে দেব যমইত্যেব নামতঃ॥

৪. ধর্মেণেমা প্রজাঃ সর্ব যস্মাদ্রঞ্জয়াস প্রভো।
তস্মাত্তে ধর্মরাজেতি নাম সম্ভির্নিগদ্যতি॥ —মৎস্যপুরাণ—২১৩—১—৩
অন্বার্থ—হে ধর্ম ও অধর্মের বিধানজ্ঞ, সকল ধর্মের প্রবর্তক, তুমি জগতের নাথ, প্রজাগণের নিয়ন্তা, কর্মানুসারে প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত কর বলে তুমি যম নামে প্রসিদ্ধ। সকল প্রজাকে যেহেতু ধর্মের দ্বারা পালন কর সেইজন্য সৎব্যক্তিগণ তোমাকে ধর্মরাজ বলেন।

৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত। —আদিপর্ব্ব

৬. রাজশেখর বসুর অনুবাদ কৃত সংক্ষিপ্ত মহাভারত | পৃঃ—২৩৪

৭. "যোহি ধর্মঃ স বিদুরো বিদুরো যঃ স পাণ্ডবঃ।"

৮. মহাভারতের কথা—বুদ্ধদেব বসু—পৃঃ ১৮ [পিতৃপরিচয় পর্ব]

৯, ঐ

১০, ঐ ['গোত্র বিচার' দ্রষ্টব্য] পৃঃ—৩৬।

১১. একদা অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একটি মৃগমিথুনকে শরবিদ্ধ করেছিলেন পাণ্ডু। তখন পুরুষ মৃগটি তাঁর আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছিল—"মহারাজ, আমি কিমিন্দম মুনি, পুত্র কামনায় মৃগরূপ ধারণ করে পত্নীর সহিত সংগত হয়েছিলাম। তুমি জানতে না যে আমি ব্রাহ্মণ, সেজন্য তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু আমার শাপে তোমারও স্ত্রীসংগমকালে মৃত্যু হবে।" —মহাভারত (সারানুবাদ)—রাজশেখর বসু। পৃঃ—৪৩

১২. মহাভারত—বুদ্ধদেব বসু—পৃঃ—১১ ['পিতৃ পরিচয়' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

১৩, মহাভারতের কথা—বুদ্ধদেব বসু

১৪. দানিকেন তত্ত্বে দেবতারা ভিন্ গ্রহের অধিবাসী—পৃথিবীতে তাঁরা উন্নততর সভ্য মানুষের স্রষ্টা—এই চিন্তাধারা একান্তই বিজ্ঞানবিরোধী।

১৫. একদা কিশোর রাজপুত্রগণের জলক্রীড়ার সময় প্রতিহিংসাবশতঃ খাদ্যে বিষ মিশিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় লতাপাতায় বেঁধে ভীমকে জলে ফেলে দিয়েছিল দুর্যোধন। ভীমকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুলা পাণ্ডব-জননী কুন্তী অনতিবিলম্বে বিদুরকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সন্দেহ ও আশঙ্কার কথা বলেছেন—"হে মহাপ্রাজ্ঞ, জলক্রীড়া হইতে ভীম ফিরিয়া না আসায় আমার সন্দেহ হইতেছে—দুর্মতি দুর্যোধন হয়তো তাহাকে হত্যা করিয়াছে।" তখন মহামতি বিদুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—"ভীম অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে। আপনার পুত্রগণ সকলই দীর্ঘায়ু মহর্ষি ব্যাসদেব ইহা বলিয়াছেন।" [উদ্ধৃত অংশাবলী 'মহাভারতের চরিতাবলী' থেকে গৃহীত]—মহাভারতের চরিতাবলী—সুখময় ভট্টাচার্য। পৃঃ ৭৫

১৬. রাজশেখর বসু অনুবাদিত মহাভারত—সভাপর্ব পৃঃ ১২৩

১৭, ঐ

১৮. ঐ—আদিপর্ব—পৃঃ ৫৬

১৯. মহাভারতের আদিপর্বে অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনীর আসরে কর্ণকে সূতপুত্র বলে ভীম কঠোর উপহাস করলে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন দুর্যোধন—"ভীমসেন, এরূপ বলা তোমার শোভা পায় না।

বলই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বীরপুরুষ এবং নদীর উৎপত্তিস্থান জানা শক্ত। দ্রোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শরস্তম্ব থেকে জন্মেছিলেন। আর তোমাদের জন্মবৃত্তান্তও আমার জানা আছে। কবচকুণ্ডলধারী আদিত্যসদৃশ এই নরব্যাঘ্রের জননী কি কখনও মৃগী হতে পারে।

২০, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ—রবীন্দ্রনাথ—কাহিনী

২১. অতঃ প্রিয়ং চেদনুকাঙ্ক্ষসে ত্বং
সর্ব্বেষু কার্যেষু হিতাহিতেষু।
প্রিয়শ্চ র'জন্ জড় পঙ্গুকাংশ্চ
সংপৃচ্ছ ত্বং তাদৃশাংশ্চৈব সর্ব্বাণ ॥—সভাপর্ব।৬৪—১৫

দ্রোণাচার্য

আমরা অহিচ্ছত্রের মহীপতি দ্রোণকে যতটা না-চিনি, তার চাইতে ঢের বেশি চিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ দীন দ্রোণাচার্যকে। আমরা হস্তিনাপুরের কুরুরাজ-সভার সভাসদ্ শস্ত্র-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আচার্য দ্রোণকে তেমন না চিনলেও কুরুরাজ কুমারগণের অস্ত্রগুরু হিসাবে তাঁকে অবশ্যই বেশি চিনি। রাজা দুর্যোধনের অনেক দুষ্কর্মের সহযোগী সভাসদ দ্রোণকে যতটা স্মরণে না-রাখি তার চাইতে অনেক অনেক বেশি মনে রাখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঁচাশী বছরের বৃদ্ধ অমিত বল-বিক্রমশালী কুরু সেনাপতি বীর দ্রোণ.চার্যকে। কৌরব পক্ষের প্রধান পুরুষ পিতামহ ভীষ্মের পরই তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের একটি পর্বই তাঁর নামে নিবেদিত। তথাপি তাঁর জন্ম পরিচয় সম্পর্কে ঠিক তেমনটি পরিচিত নই।

মহাভারতের আদিপর্বে একস্থলে তাঁর জন্মপরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সূত্রে বলা হয়েছে যে, "এক দ্রোনীতে অর্থাৎ কুম্ভে উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃপাত হয়, তাহাতেই দ্রোণাচার্যের জন্ম হইল।"[১] মোটকথা, এতে দ্রোণের পিতৃপরিচয় পাওয়া গেলেও মাতৃপরিচয় মেলেনা কোথাও। উপরন্তু, 'দ্রোণী' শব্দের অর্থ নিয়ে দেখা দিয়েছে বিপত্তি। আভিধানিক অর্থে—ডোঙ্গা, ডিঙ্গি, জলসেচনী, দুনি কলসী বা কুম্ভ, পর্বতগুহা বা দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে 'দ্রোণী' শব্দের তাৎপর্যে। মহাভারতের প্রাসঙ্গিক শ্লোকব্যাখ্যায় একজন পণ্ডিত একস্থলে বলেছেন যে, উগ্রতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোণীতে অর্থাৎ পর্বতগুহায় ক্ষরিত হয়েছিল। সেই শুক্র হতে দ্রোণের জন্ম।[২] অন্যত্র আবার তিনিই বলেছেন যে, সেই ধীমান মহর্ষির যজ্ঞিয় কলসে দ্রোণের জন্ম হয়েছিল।[৩] দোষটা পণ্ডিত প্রবরের নয় আদৌ। কেননা তিনি মূল মহাভারতের অনুসারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র। মাতার পরিচয় না থাকায় মহর্ষি তনয় দ্রোণকে বলা হয়েছে অযোনিসম্ভব। দ্রোণাচার্যের জন্ম অযোনিসম্ভব কিনা সেকথা বলার আগে তস্য পিতা মহর্ষি ভরদ্বাজ সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছে, মহাভারতে তাঁর বিষয় বলা প্রয়োজন আগে।— "ভারতবর্ষের উত্তর-সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয় নামক পর্বত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত

মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভি-ব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরাগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল, দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনা মদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিত কলেবর হইলেন। দুর্জ্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ দ্রোণী মধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন।"[৪]

কলসের মধ্যে দ্রোণের জন্ম প্রসঙ্গে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, "এটা অসম্ভব বা অবাস্তব বলে দু'বছর আগেও আমরা ভাবতাম। কিন্তু বর্তমানে টেস্ট টিউব শিশু জন্মেছে এ দৃষ্টান্ত দেখে ওটা সম্ভব বলে মেনে নেওয়া অযৌক্তিক নয়।[৫] লেখক ভদ্রলোক টেস্টটিউব বেবি বা নলজাতক শিশুর কথা শুনেছেন বা জেনেছেন সংবাদপত্রের বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে যেমন জেনেছেন আরও অনেকেই।[৬] বিষয়টাকে তলিয়ে ভাবেননি তিনি। প্রকৃতপক্ষে, 'টেস্ট টিউব বেবি' কথাটা আজ পর্যন্ত অসম্ভব এবং অবাস্তব। বিজ্ঞানের অভিধানে যদিও অসম্ভব বলে কিছু নেই, তথাপি নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, অন্তত বহুকাল অবধি প্রকৃত নল-জাতক শিশুর আবির্ভাব অসম্ভব হয়েই থাকবে। এর প্রধান কারণ এই যে, টেস্টটিউবের মধ্যে প্লাসেণ্টা বা ফুল তৈরী হয় না। মাতৃগর্ভের ফুল থেকেই ভ্রূণ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য যথা রক্ত আর পুষ্টি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, বাড়ে, বড়ো হয় এবং একদিন এই পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখে। কাজেই যতদিন না কৃত্রিম উপায়ে ফুল সৃষ্টি করে টেস্টটিউবে কার্যকরভাবে সংস্থাপন সম্ভব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নলজাতক শিশুর জন্ম অসম্ভব। বস্তুতঃ 'টেস্ট-টিউব বেবি' কথাটাই বিভ্রান্তিকর। কেননা টেস্ট-টিউব বেবি বললে সরলার্থে যা বোঝায় তা হচ্ছে, যে-শিশুর পক্ষে আদৌ মাতৃগর্ভের প্রয়োজন হয়নি অর্থাৎ টেস্ট-টিউবের মধ্যেই পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণু মিলনের পর নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়ে নলের মধ্যেই যার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপ সম্ভব হয়েছে জন্মলাভ এমন শিশুকেই বলা যেতে পারে নলজাতক শিশু বা টেস্ট-টিউব বেবি। বাস্তবে তা ঘটেনি। এতাবৎ কালের সাধনায় বিজ্ঞানীরা যা করতে পেরেছেন তা হচ্ছে মাতৃজঠরের বাইরে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি এবং সেই ভ্রূণকে জরায়ুতে সংস্থাপন করে জন্ম সম্ভব করেছেন

নবজাতকের। বিজ্ঞানীদের সুদীর্ঘকালের এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ জীব-বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরাট সাফল্য নিঃসন্দেহে।[৭]

প্রাগুক্ত লেখক ভদ্রলোকের বিজ্ঞানের এই জ্ঞান না থাকায় বলেছেন যে, "বর্তমানে টেস্টটিউব শিশু জন্মেছে এ দৃষ্টান্ত দেখে ওটা সম্ভব বলে মেনে নেওয়া অযৌক্তিক নয়।" কিন্তু এখন আমরা বলতে পারি, যতদিন না আর্টিফিসিয়াল প্লাসেণ্টা অর্থাৎ কৃত্রিম ফুল তৈরীতে সক্ষম হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা ততদিন পর্যন্ত মাতৃজঠর ছাড়া মানব শিশুতো দূরের কথা একটি ইঁদুর বা খরগোসের বাচ্চারও জন্ম সম্ভব নয়। অবশ্য প্রকৃতির রাজ্যে মাতৃজঠরের বাইরে বিচিত্র উপায়ে প্রাণ-স্থষ্টির উদাহরণ যে একেবারে নেই তা বলা চলে না। যেমন মাছ বা ব্যাঙের ক্ষেত্রে শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলন ঘটে দেহের বাইরে কিন্তু জীবজগতের অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে দেহের অভ্যন্তরে।[৮] বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি মানুষসহ অন্যান্য অনেকানেক পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের জন্মের জন্য প্রয়োজন মাতৃজঠরের। কাজেই অযোনিসম্ভব দ্রোণের জন্ম সম্ভব ছিলনা মাতৃজঠরের বাইরে। অতএব অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রোণের মাতৃপরিচয় পরিহার করেছেন মহাভারতকার। কি কারণ থাকতে পারে এবম্প্রকার জন্ম পরিচয় পরিহারকরণের? কারণ অবশ্যই কিছু আছে এবং তা খুঁজে পেতে হবে আমাদের। ইতিপূর্বে আরও অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, জন্মপরিচয় চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে কিংবা উদ্ভট তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন ব্যাস-বাল্মিকীপ্রমুখ অঙ্গিরসগণ।

ভারতে নব্যপুরোহিততন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বশিষ্ঠ প্রমুখ বিশিষ্ট সপ্তঋষির অনেকেরই জন্মলাভ হয়েছে কলসীতে। কাজেই দ্রোণীতে দ্রোণের জন্ম একমাত্র নজীর নয়। কলসী আসলে মাতৃগর্ভেরই প্রতীক। সামাজিক কারণে সেইসব গর্ভধারিণীর নামোল্লেখ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারক-বাহক ঋষিপুরুষদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সুকৌশলে। যেমন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে দ্রোণের ক্ষেত্রে। লক্ষ্যণীয় যে, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দ্রোণপ্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাতৃনাম সরাসরি উল্লিখিত না হলেও অপ্সরাদের সঙ্গে তাদের জন্ম সম্পর্কের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।[৯]

স্বর্গের অপ্সরাদের গর্ভে যদি মর্ত্ত্যমানবের জন্ম সম্ভব হয়েই থাকে তাহলেই বা এত লুকোছাপার দরকার কি? অপ্সরা সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা খুবই উঁচু। তারা রূপসী, নৃত্য-গীত পটীয়সী এবং চিরযৌবনা দেবযোনিবিশেষ।

দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় তাদের যাতায়াত নিত্য এবং নিয়মিত। মর্যাদার প্রশ্নে যাদের আসন জলদেবীর পর্যায়ে উন্নীত। অতএব প্রশ্ন ওঠে, মানুষের সংসারে কেন তারা তবে অপাঙক্তেয়? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সামাজিক কারণ অনুসন্ধান ভিন্ন গত্যন্তর নেই আমাদের।

অপ্সরাদের ভিন্নার্থে বলা হয়েছে স্বর্বেশ্যা বা স্বর্বধূ। সকলেই এরা সুরসুন্দরী। সেরা রূপসী। প্রত্যেকেই একেকজন উর্বশী বা তিলোত্তমা। রাবীন্দ্রিক ভাষায় যারা—'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী'। আমাদের আটপৌরে ভাষায় না ঘরকা, না ঘাটকা। পুরাণ কথায় এদের জন্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র গর্ভ থেকে যে স্ত্রীজাতির উদ্ভব তাদেরকে বলা হয় অপ্সরা।[১০] দেবতারা প্রতিদ্বন্দ্বী মুনি-ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গের হেতু নিয়োজিত করেছে তাদের।[১১] কিন্তু তপস্বীদের তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে অনেক সময়ই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে অপ্সরাদের। ভালবাসার অভিনয় করতে এসে নিজেরাই ভালবেসে ফেলেছে সংসারবিবাগী ঋষিপুরুষদের। পরিচয় দিয়েছে চিরন্তন নারীসত্তার। সাময়িকভাবে হলেও নন্দনবাসিনী উর্বশীরা ঘর বেঁধেছে মানবালয়ে; মর্ত্যবাসী পুরুষের বীর্য স্বীয় গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিয়েছে মহান্ সন্তানদের। তথাপি মানুষের সংসারে সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে পারেনি তারা। তার প্রধান কারণ, মর্ত্যলোকে তাদের বিবাহিত জীবন-যাপন ছিল একান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার। মহৎ ছলনাই ছিল এইসব ললনাদের অমোঘ আয়ুধ। লোকসমাজের গার্হস্থ্য জীবনে যা ছিল গুরুতর অপরাধ। অবৈধ সন্তানের জন্মদান ছিল রীতিমত ঘৃণ্য। যে-কারণে অপ্সরাদের গর্ভজাত সেইসব সন্তানের কথা গোপন করতে হয়েছে সমাজপতিদের।

বস্তুতঃ আর্যদের মত অপ্সরারা আগন্তুক ছিলনা এদেশে। তারা এ দেশের আদি অধিবাসীদেরই সন্তান। বিজয়ী আর্যদের ভোগ্যা হওয়ায় সমাজচ্যুত হতে হয় তাদের এবং বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তির পথ অবলম্বন করতে হয় স্বর্গে-মর্ত্যে সর্বত্র। দেবনামধারী আর্য প্রভুরা তাদের রক্ষিতাই রাখেনি শুধু আকছার দালালের ভূমিকায় নিয়োগ করেছে তপোবলে কিংবা বাহুবলে স্বর্গরাজ্য অভিলাষী রাজা বা ঋষিদের বিরুদ্ধে। দেবতাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষায় অপ্সরাদের এই জঘন্য বৃত্তি নিন্দিত হয়েছে মানব-সমাজে। তথাপি তাদের সেই ট্রাডিশন সমানে চলে এসেছে দেবদাসী তথা কিছুকাল আগের বাঈজীদের আমল পর্যন্ত।[১২] তবে এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

পশুপালক আর্যরা যখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে ভারতে পদার্পণ করেছিলেন তখন তাদের সঙ্গে যত গরু ছিল তত জরু (স্ত্রী) ছিলনা ; তাদের সঙ্গে যত ঘোড়া ছিল স্ত্রী-পুরুষের তত জোড়া ছিলনা নিঃসন্দেহে। একারণে বিজিত দেশের পুরুষেরা হয়েছে তাদের দাস বা দস্যু আর নারীরা হয়েছে বিজয়ী পুরুষদের ভোগ্যবস্তু এবং সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র। তখন বাছ-বিচার ছিলনা। অনাচারই ছিল ধর্মসম্মত। এতে মুনি-ঋষিদেরও জন্মসম্ভব হয়েছে নিশ্চিত। এ প্রসঙ্গে এদেশে ইউরোপীয়-গণের আগমনের কথা স্মরণীয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্য ব্যপদেশে সাহেবরা যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তাদের সঙ্গে মেম-সাহেবরা ছিলেন সংখ্যায় অতি নগণ্য। কাজেই সাহেবদের আয়া আর জায়ার কাজ চালিয়েছে এদেশের অন্ত্যজ রমণীরাই বেশি। তাদের সন্তানরাই হয়েছে বর্ণসংকর ফিরিঙ্গি। এরা না হয়েছে পুরো ইউরোপীয়, না হয়েছে পুরো ভারতীয়। উভয় মহাদেশের লোকের চোখে একরকম অশ্রদ্ধেয় রয়ে গিয়েছে ফিরিঙ্গি সমাজ। তথাপি আমরা তার মধ্য থেকে পেয়েছি বিদ্রোহী ডিরোজিওর মত বরেণ্য সন্তান। এদিক থেকে বর্ণসংকর প্রাচীন ভারতীয় আর্যঋষিরা বরং ঢের বেশি সৌভাগ্যবান। রাজন্যবর্গের সঙ্গে শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসানে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসাবে তারা লাভ করেছেন সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি। কাজেই আমরা যারা আজও গোত্রপ্রধান আর্যগণের সন্তান-সন্ততি বলে গর্ব অনুভব করি তারা বর্ণসংকর তো বটেই পরন্ত পিতৃভূমির পরিবর্তে পুরুষানুক্রমে মাতুলালয়ে বসবাস করছি বরাবর। কিন্তু কালক্রমে শূদ্রজাতির প্রতি ব্রাহ্মণদের মোড়লীপনা এমনই এক জঘন্য স্তরে এসে পৌছেছিল যে, "যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তাকে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয়না।"[১৩]

মহাভারতের যুগে প্রাচীনতর সমাজব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও পুত্র-লাভের ক্ষেত্রে পূর্বকালের রীতি-নীতিই অনুসৃত হয়েছে দ্বিধা সত্ত্বেও। কুরু কুল-তিলক মহারাজ পাণ্ডু তদীয় পত্নী কুন্তীকে পরপুরুষ নিয়োগে যেমন পুরাকালের মহিলাদের আচরণ সম্পর্কে বলেছেন—"পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীন-তায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম হইত না। ফলতঃ, তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল।[১৪] ঋতুকালে পতিগমন ব্যতিরেকে অন্য সময়ে রতি

ক্রিয়ায় বাধ্যবাধকতা ছিলনা। প্রসঙ্গক্রমে মহারাজ পাণ্ডু উদ্দালক শ্বেতকেতুর কাহিনী শুনিয়েছেন তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে।[১৫] কাহিনীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার স্মৃতি বিজড়িত। শ্বেতকেতুকে আমরা দেখতে পেলাম পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পাণ্ডারূপে। তিনি পিতার বাক্য লঙ্ঘন করে জোরপূর্বক নিয়ম বেঁধে দিলেন যে, 'অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ-করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণ হত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে তাহারও ঐ পাপ হইবে।' অতএব স্বামীর ঐকান্তিক আগ্রহেই পরপুরুষ নিয়োগের দ্বারা আপন গর্ভে পুত্রোৎপাদনে রাজী হতে হয়েছে কুন্তীকে।

মহাভারতের যুগেই পলিগ্যামী থেকে মনোগ্যামীর অর্থাৎ অনাচার থেকে সভ্যতার দিকে যাত্রা শুরু। এখানে বলতে পারলে ভাল হোত যে,—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

কিন্তু তা বলা গেলনা। কেননা আমরা দেখতে পেলাম যে, শূদ্র ও ব্রাত্যদের মত স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে তাদের। সদাচার ধর্মাচরণের নামে বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা হয়েছে পুরুষের ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত আর অপ্সরা জাতীয় সুন্দরী পরীরা হয়েছে সামাজিক সম্পত্তি। আর্য সমাজের নয়া বিধি-বিধানের বলে স্বর্বেশ্যা অপ্সরারা আচরে পরিণত হয়েছে মন্দিরবাসিনী দেবদাসীতে। মধ্যযুগ পর্যন্ত চলেছে এই রীতি, এই নীতি।[১৬] দেবদাসীরা আসলে অভিজাত শ্রেণীর বেশ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। সেকালে দেবতার নামে মন্দিরে কন্যাদান বা উৎসর্গ ছিল অতি পুণ্যকর্ম। মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গকারীরা ইহলোকে মহাধনী ও পরলোকে কল্পকাল স্বর্গবাসের অধিকারী বলে সাধারণ মানুষকে প্রলোভিত করেছে পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ড। সূর্যমন্দিরে বেশ্যা দান করা সূর্যলোক প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে ভবিষ্যপুরাণে। 'বেশ্যা' কথাটিই ব্যবহৃত হয়েছে পুরাণের সংশ্লিষ্ট শ্লোকে। যাই হোক, যৌবন ফুরাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত এইসব দেবদাসীদের। কলিযুগের লক্ষ্মীরা তখন ভিক্ষা বৃত্তিতে অথবা ধর্মপ্রাণ লোকেদের দয়া-দাক্ষিণ্যে কাটাতে বাধ্য হত তাদের বাকী জীবন।[১৭] বস্তুত, They are exploited by the aristocrats of this

country. এতে নিদারুণ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে এদেশের রাজকুল ও পুরোহিত কুলের ধর্মের ভণ্ডামি।

অভিজাততন্ত্রের আপন স্বার্থেই অশেষ রূপ-গুণসম্পন্না অপ্সরা বা দেবদাসী বা বাঈজীদের ইমেজ অর্থাৎ ভাবমূর্ত্তি উজ্জ্বল করে আঁকা হয়েছে যুগে যুগে। কিন্তু লোকসমাজ তাদের বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখলেও সগোত্রীয় জীব হিসেবে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে পারেনি কখনও। তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরও দিতে পারেনি সামাজিক মর্যাদা। এ কারণেই হয়ত অপ্সরা বা দেবদাসী বা বাঈজীদের সন্তানধারণ করা ছিল অসম্মানজনক। নিষিদ্ধ বা অপরাধমূলক। এইতো উনিশ শতকের কথা। আমরা ভুলে যেতে পারিনি বারবনিতা হীরা বুলবুলের কাহিনী। তার ছেলের স্কুলে পড়া নিয়ে ঘটে গেল কত কাণ্ড! নজীর হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে এমন অসংখ্য পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিপূর্বে আমরা অন্যত্র বলেছি সত্যকাম-জবালার কথা। সুতরাং নতুন করে বলার কিছু নেই আর।

গঙ্গাদ্বারে অর্থাৎ হরিদ্বারে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। ভরদ্বাজ ছিলেন চিরকুমার, জিতেন্দ্রিয়। তাঁর সময় কাটতো জপ, তপ ও যাগ-যজ্ঞ নিয়ে। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে স্নান করে শুচি-শুদ্ধ হয়ে তারপর শুরু করতেন তাঁর প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ। একদা স্নানে গিয়েছেন ঋষি। সেদিন "অপ্সরা অগ্রগণ্যা ঘৃতাচীও নির্জন নদীতীরে জনমানব নেই দেখে দেহের বস্ত্র তীরে রেখে বিবস্ত্রা হয়ে স্নান করছিলেন।...ঘৃতাচী ভরদ্বাজকে দেখে তাড়াতাড়ি তীরে উঠে বস্ত্র পরিধান করতে উদ্যত হলেন।...সুরূপা নবযৌবনা, মদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবস্ত্রা দেখে কামানলে জলতে লাগলেন ভরদ্বাজ। · ঘৃতাচী কামাতুর পুরুষের হাত থেকে রক্ষা পেতে আশ্রয় নিলেন দ্রোণীর মধ্যে। অর্থাৎ ডোঙ্গা নৌকার ভিতরে। দ্রোণীর ভিতর তিনি মিলিত হলেন অপ্সরা ঘৃতাচীর সাথে।"...১৮

বলা বাহুল্য যে, ভরদ্বাজ-ঘৃতাচীর মিলনের ফলে জন্ম হয়েছিল দ্রোণের এবং দ্রোণীর ভিতর জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম রাখা হয়েছিল দ্রোণ। এ পর্যন্ত লেখকের সঙ্গে মতের অমিল নেই আমার কিন্তু পরে তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে সায় দেওয়া কঠিন। তিনি বলেছেন—পাঁচটি বছর ঘৃতাচী পুত্রকে মানুষ করেছিলেন মায়া-মমতা ও স্নেহ দিয়ে। পাঁচ বছর পরে পুত্রের মঙ্গল কামনায়, সে যাতে দশের একজন হতে পারে সেই আশায় তিনি তাঁকে তাঁর বাবার কাছে

পাঠিয়ে দিলেন।"[১৯]

এই তথ্য কোথায় পেলেন লেখক? মহাভারতে কোথাও এমন তথ্যের অবতারণা হয়েছে বলে আমাদের অন্ততঃ জানা নেই। সম্ভবতঃ এ তাঁর কল্পনা-প্রসূত কাহিনী। স্বকপোল কল্পনায় এমন কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমাদের। অপ্সরাদের চরিত্রানুযায়ী গর্ভধারণই যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে অবৈধ সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্ন অবান্তর। বিশ্বামিত্র-মেনকার প্রণয় কাহিনী আমরা জানি এবং তার উল্লেখও হয়েছে ইতিপূর্বে। মেনকার সেই অবাঞ্ছিত কন্যা প্রতিপালিত হয়েছিল কণ্বমুনির আশ্রমে। নাম তার শকুন্তলা। এই মেনকাই আবার গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুকে ফাঁসাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যান নিজে।[২০] অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন তিনি। একে ত অধিকার বহির্ভূত ব্যাপার তার উপর গর্ভমোচন না করে স্বর্গে ফিরে যেতে পারেন না বিশ্বেশ্বরী। তাই আসন্ন প্রসব-কালে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে গেলেন মেনকা এবং অতি গোপনে আশ্রমের এককোণে গর্ভবিমোচন করে স্বর্গবাসে ফিরে গেলেন তিনি। তাঁর এই মেয়ের নাম প্রমদ্বরা। ঘৃতাচীর পুত্র রুরু[২১] তাকে ভালবেসে বিয়ে করেন এবং তাদের প্রেমের কাহিনী অপূর্ব মহিমা নিয়ে বেঁচে আছে মহীতলে।
সংক্ষেপে এই, স্বামী রুরু তার পরমাণুর অর্ধেক দিয়ে পুনর্জীবিতা করেছিলেন সর্পাহতা মৃতাপত্নী প্রমদ্বরাকে। যাই হোক, অপ্সরারা সন্তান পালনের দায় বহন করেনি কোনদিন। স্বামী বা প্রণয়ী রাজী হলে তাদের উপর সন্তানের দায় ফেলে দিয়ে ফিরে গেছে ইন্দ্রলোকে। অবৈধ মিলনের ফলে পুত্রসন্তান জন্ম নিলে অনেক ক্ষেত্রে তবু সন্তানের পিতৃপরিচয় দিয়েছে প্রণয়ীরা কিন্তু কন্যার বেলায় নৈব নৈব চ। এর উল্টোটা দেখা যায় বাইজীদের বেলায়। তারা পুত্রসন্তান পছন্দ করেনি। বরং কন্যাসন্তানকে নিজের মত করে প্রতিপালন করেছে তারা। কাজেই অপ্সরা ঘৃতাচী যে পাঁচ বছর ধরে নারীর মমতা আর মাতার স্নেহ দিয়ে পালন করেছিলেন দ্রোণকে এমত বিশ্বাস করা কঠিন। ঋষি ভরদ্বাজের উপর পুত্রের ভার সমর্পণ করে তাঁর পক্ষে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

দ্রোণ যে বাল্যকালে পিতা ভরদ্বাজের কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার কিছু বর্ণনা আছে মহাভারতে। পাঞ্চালরাজ পৃষত ছিলেন মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা। তাঁর পুত্র দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়ে দ্রোণের সঙ্গে খেলা করতেন, এবং অধ্যয়ন করতেন একত্রে। কিছুদিন পর রাজা পৃষত পরলোকগত হলে সমগ্র উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হয়ে রাজ্যশাসন করতে থাকেন দ্রুপদ।

এদিকে মহর্ষি ভরদ্বাজও দেহত্যাগ করলেন। দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থেকেই বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ও তপস্যায় রত হলেন অতঃপর।

সংসারে পিতৃ-পরিচয়হীন শিশুকে বলা হয় জারজ সন্তান। পিতা সৎ বা অসৎ সে প্রশ্ন ওঠে কদাচিত। কিন্তু মাতা সতী না অসতী সে প্রশ্ন এড়ানো কঠিন এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। যুক্তির খাতিরে কবির কথা শিরোধার্য করে বলতে হয়—"অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়, অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।"[২২] কিন্তু সমাজ-সংসারে অর্থনীতির চাবিকাঠি যাদের হাতে তাদের সাতখুন অপরাধ মাপ। সেই মহাভারতের যুগ থেকে অদ্যাবধি পুরুষশাসিত সমাজে পিতৃপরিচয় থাকা একান্তই দরকার। তাতে সৎ-অসতের প্রশ্ন নেই। অথচ কোনও কুমারী মাতা বা বেশ্যা-বাঈজীর সন্তানকে ক্ষমার চোখে দেখেনি সমাজ। যে কারণে সমাজপতিরা অবাঞ্ছিত সন্তানের মাতৃপরিচয় চাপা দিয়ে গেছেন সুকৌশলে। বিশেষ করে সন্তানের পিতা যদি হন উচ্চবর্ণের বা অভিজাত শ্রেণীর। তথাপি "স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীপুত্র মহাবীর দ্রোণ,[২৩] একথা আজ চাপা দেওয়া চলেনা কোনমতেই।

মজার কথা এই, ব্যাস-বশিষ্ঠ প্রমুখ জারজ সন্তানগণই ভারতে নব্যপুরোহিত তন্ত্র তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির জন্মদাতা এবং তাঁদের উত্তরসূরী দ্রোণ-কৃপ প্রমুখ আচার্যগণ তারই ধারক-বাহক।[২৪] সবার উপরে টেক্কা দিয়েছেন গুরু দ্রোণ। শূদ্র যাতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে না পারে তার জন্য তাঁর গর্হিত আচরণ মানবতার দিক থেকে ক্ষমারও অযোগ্য। বর্ণের দোহাই পেড়ে কর্ণের মত বীরকে বঞ্চিত করেছেন ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যাদানে। সব চাইতে অবিচার করেছেন তিনি নিষাদ বালক একলব্যের প্রতি।[২৫]

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১. কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত।
সাক্ষরতা প্রকাশন / প্রথম প্রকাশ।

২. ভরদ্বাজস্য চ স্কন্দং দ্রোণ্যাং শুক্রাম বর্দ্ধত।
মহর্ষেরুগ্রতপস্তাদ্ দ্রোণো ব্যজায়ত॥ আদিঃ ৩ | ১০৬

৩, ততঃ সম ভবদ্ দ্রোণঃ কলশে তস্য ধীমতঃ। আদিপর্বঃ ১৩০/৩৮
—মহাভারতের চরিত্রাবলী গ্রন্থে দু'জায়গায় দু'রকম বলেছেন সুখময় ভট্টাচার্য। তিনি

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহাভারতের 'মূল শ্লোকের ব্যাখ্যাকারী মাত্র। তর্জমার বাংলা লেখকের নিজস্ব।

৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত/আদিপর্ব/সাক্ষরতা প্রকাশন/প্রথম প্রকাশ।

পৃঃ—১৩৬।

৫. পঞ্চ অপ্সরা/সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী/পৃা—১১৪। অনুরূপ মন্তব্য করেছেন 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির গ্রন্থের লেখক বীরেন্দ্র মিত্র। —দ্রষ্টব্য বিদুরের ধর্ম'.

৬. ১৯৭৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর ক্যামাকাটা নার্সিং হোম থেকে ডঃ সরোজকান্তি ভট্টাচার্য ভারতের প্রথম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় টেস্ট টিউব বেবি'র জন্মসংবাদ দেন যুগান্তর পত্রিকার বার্তা বিভাগের সাংবাদিক শ্রীরমেন মজুমদারকে। রমেনবাবুই প্রথম বিশ্ববাসীর কাছে এই সংবাদ পরিবেশন করেন ৫ই অক্টোবর রাতে দূরদর্শন মারফৎ এবং ৬ই অক্টোবর সকালে সংবাদটি পূর্ণাঙ্গাকারে প্রকাশিত হয় যুগান্তর পত্রিকায়। সংবাদটি শিরোনাম সহ যে-ভাবে যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছুটা নমুনা, যেমন :—

ভারতের প্রথম নলজাতক কলকাতায় ভূমিষ্ঠ / রমেন মজুমদার: মঙ্গলবার সকাল এগারোটা চোদ্দ মিনিটে কলকাতা শহরে এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে—এই শহরের এক অভিজাত নার্সিং হোমে এক নলজাতকের জন্ম হয়েছে। ভারতে নলজাতকের (টেস্ট-টিউব বেবি) জন্ম এই প্রথম। পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতে টেস্ট-টিউব বেবির জন্মও বোধ হয় এই প্রথম। ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

—নলজাতকের উপাখ্যান / রমেন মজুমদার দ্রষ্টব্য।

৭. বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম নলজাতক মানবশিশু লুইজি জয় ব্রাউন। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই ইংল্যাণ্ডের ওল্ডহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে তার জন্ম। লুইজির মা লেজলি ব্রাউন এবং বাবা গিলবার্ট জন ব্রাউন। যে দুইজন বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর কৃতিত্বে লেজলি প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন তাঁরা হলেন ওল্ডহ্যাম জেনারেল হাসপাতালের প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্যাট্রিক স্টেপটো এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শারীরবিদ্যা বিশারদ ডাঃ রবার্ট এডওয়ার্ডস।

বিশ্বের দ্বিতীয় নলজাতক শিশু দুর্গা আগরওয়াল। পিতা প্রভাতকুমার এবং মাতা বেলার বিবাহ হয় ১৯৬৩ সালে কিন্তু ১৬ বছরেও তাদের কোন সন্তানাদি হয়নি। ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বেলাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ফ্যালোপিয়ান দুটি টিউবই বন্ধ। লেজলি ব্রাউনেরও ফ্যালোপিয়ান টিউব দুটি ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। ওভাম অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে নির্গত ডিম্বাণুর যাত্রাপথে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে শুক্রাণুর সঙ্গে মিলনের পথ থাকে রুদ্ধ। লেজলির ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করে ত্রুটিপূর্ণ ফ্যালোপিয়ান নল দুটি কেটে বাদ দিয়েছিলেন ডাঃ স্টেপটো কিন্তু বেলার বেলায় তার অবরুদ্ধ ফ্যালোপিয়ান টিউব দুটিতে হাত না দিয়ে জঠরের বাইরে সৃষ্ট ভ্রূণকে বেলার জরায়ুতে সংস্থাপন করেন ডাঃ মুখোপাধ্যায়। লেজলিরও তাই। চলতি কথায় একে টেস্ট-টিউব বললেও প্রকৃতপক্ষে

থাকে বলা উচিত ভ্রূণ সংস্থাপন / ইংরাজীতে একে বলে এম্ব্রায়ো ট্রান্সফার (Embryo Transfer) ।

৮. জলের মধ্যে স্ত্রী-মাছ ডিম পাড়ার সময় পুরুষ-মাছ এসে ঐ ডিমের ওপর শুক্র নিক্ষেপ করে। তারফলে নিষিক্ত হয় ডিমগুলি। ঝাঁকে ঝাঁকে জন্ম নেয় মাছের পোনার। তবে সব ডিমের ওপর শুক্র নিক্ষেপ সম্ভব হয় না বলেই নষ্ট হয়ে যায় অনেক ডিম। ব্যাঙের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো মজার। একসাথে সাদা ডিম পাড়ে স্ত্রী-ব্যাঙ। কিন্তু ডিমগুলি তার দেহ থেকে নির্গত হবার আগেই পুরুষ-ব্যাঙ এসে তার ঘাড়ে চেপে বসে। স্ত্রী-ব্যাঙের শরীর থেকে যেমন যেমন ডিম বেরুতে থাকে অমনি পুরুষ-ব্যাঙ তার শুক্রাধার খুলে দেয় সেই সদ্য প্রসূত ডিমের উপর। —নলজাতকের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

৯. ·· His (Vasistha's) mother is not mentioned, On the contary, he was—in one and the same account—'born of the mind of Urvasi' (an apsaras or water goddess); born also of a jar which received the combined semen of the two gods ; ···Agastya, a founder of another major brahmin clan group still extent was similarly born a or jar. The jar represents the womb and thereby the mother goddess.··· --D. D. Kosambi

১০. "দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্রগর্ভ উদ্ভূত স্ত্রীজাতি ; অপ্ (জল) থেকে উৎপন্ন তাই অপ্সরা নাম। দেব এবং অসুর কোন পক্ষই এদের গ্রহণ করেন না ; তাই স্বর্গের বিদ্যাধরীরূপে পরিগণিত।"—বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড/সাক্ষরতা প্রকাশন।

একটি ঘটনা যেমন—

১১, "পূর্বকালে বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে মেনকাকে পাঠিয়ে দেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন ক'রে নৃত্য করতে লাগলেন, সেই সময়ে তাঁর সূক্ষ্ম বসন বায়ু হরণ করলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবস্ত্রা মেনকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তার সাথে মিলিত হলেন। মেনকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, তিনি গর্ভবতী হলেন এবং একটি কন্যা প্রসব করেই তাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে ইন্দ্রসভায় চ'লে গেলেন।"···

১২. পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় সুপ্রাচীন সভ্যতা কেন্দ্রগুলির মন্দিরে মন্দিরে দেবতার মনোরঞ্জনে বহু নৃত্যগীত পটিয়সীদের নিয়োগের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরের ওসিরিসও আইসিস মন্দিরে এই জাতীয় দেবদাসীদের প্রচুর সংখ্যায় বিরাজ করতে দেখা গেছে। গ্রীসের ভেনাস মন্দিরেও হাজার হাজার যুবতীর নিজেদের উৎসর্গের কথা আজ আর নতুন নয়। এদের দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থে মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ হোতো। হিব্রু ও ব্যাবিলোনীয় সভ্যতাতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালীন ধর্মীয় চিন্তাধারায় দেবতাদেরও মানুষের মতো কামনা বাসনার অধীর বলে মনে করা হোতো, তাছাড়া রাজা বা সম্রাটরা বিশেষ করে মিশরের ফারাওরা তো ছিলেন দেবতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। শক্তিশালী পুরোহিত গোষ্ঠির

সহযোগিতায় এক ধর্মসম্মত প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। দেবতার নামে কার্যত রাজতন্ত্র পুরোহিততন্ত্রের ভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়েছিল দেশের বাছাই করা সুন্দরীদের। …পরবর্তী কালে এই রীতি একসময়ে ভারতের মন্দিরগুলিতেও প্রচলিত হয়েছিল।"…

—প্রসঙ্গ : দেবদাসী / মিলন সেনগুপ্ত / পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ / ১. ৯. ৮৪

১৩. তিনশো একুশ মোড়লের প্রতি মেজো সর্দারের উক্তি। —রক্তকরবী / রবীন্দ্রনাথ

১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত। —আদিপর্ব্ব দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

১৫. ঐ। কাহিনী আছে—"পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'আইস, আমরা যাই।' ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন 'বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্যধর্ম্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয়না।"…

১৬. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকে মূলতানের সূর্য মন্দিরে রাজানুগ্রহে নিযুক্ত অসংখ্য দেবদাসী দেখেছিলেন। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে ঐ সময় কাশ্মীরেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। সোমনাথ মন্দিরে বিগ্রহের মনোরঞ্জনের জন্য পাঁচশ দেবদাসী নৃত্যগীত পরিবেশন করত। দক্ষিণ ভারতে পাওয়া অনেকগুলি লিপির মতে সে দেশে নবম শতক থেকেই এ প্রথার বহু প্রচলনের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। দশম শতকে চোল সম্রাট তাঞ্জোরের বিখ্যাত বৃহদীশ্বর শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে কমপক্ষে চারশ' দেবদাসী উৎসর্গ করা দোষাবহ নয়। তার এক প্রমাণ পাওয়া যায় চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি মহাদেবের কার্যকলাপে।…

প্রসঙ্গ : দেবদাসী / মিলন সেনগুপ্ত

১৭ দক্ষিণ ভারতের শিব মন্দিরগুলিতে উৎসর্গীকৃত দেবদাসীদের বলা হোত লিঙ্গ বাসবী আর বিষ্ণু মন্দিরের দেবদাসীদের গরুড় বাসবী। দুই দেবতার প্রতীক চিহ্ন উল্কির সাহায্যে এঁকে দেওয়া হোত বুকে অথবা উরুতে। যৌবন ফুরোতে এদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যেত। অতঃপর কালযুগলক্ষ্মী নামকরণ করে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হোত তাদের।

১৮. পঞ্চ অপ্সরা : সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী / পৃষ্ঠা : ৯৯—১০০

১৯. ঐ

[লেখকের সমস্ত কথা হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি যদিও, তথাপি কোথাও গরমিলের অবকাশ নেই]

২০. গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু ব্রহ্মার কৃপালাভে আরও শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তপস্যা শুরু করে। ঐ কঠোর তপস্যায় বিব্রত হয়ে বিঘ্ন ঘটাতে যথারীতি মেনকাকে পাঠান হয় সেখানে। মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বাবসু তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। মেনকাকে রাজী হতে হয়। অতঃপর উভয়ে পরম সুখে রতিবিহার করতে থাকায় অচিরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন মেনকা।

২১, একদা বরুণ দেবের যজ্ঞ করেছিলেন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা। সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগুর উৎপত্তি। ভৃগুর পুত্র চ্যবন। তার পুত্র প্রমতি। এই প্রমতি ছিলেন সাতিশয় ধার্মিক ও মৃগয়াসক্ত। মৃগয়াকালে একদা বনমধ্যে পরমা সুন্দরী এক রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করেন তিনি এবং তার পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী অপ্সরা ঘৃতাচী। প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে রুরু।

২২, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের সাম্যবাদী কবিতার বারাঙ্গণা অংশ দ্রষ্টব্য।

২৩, ঐ

২৪. দ্রোণাচার্যের মত কৃপাচার্যের জন্মবৃত্তান্তও রহস্যময়। কথিত আছে, "মহর্ষি গৌতমের শরদ্বান নামে এক শিষ্য ছিলেন, তাঁর ধনুর্বেদে যেমন বুদ্ধি ছিল বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী নামে এক অপ্সরা পাঠালেন। তাঁকে দেখে শরদ্বানের হাত থেকে ধনুর্বাণ প'ড়ে গেল এবং রেতঃ পাত হ'ল। সেই রেতঃ একটি শরস্তম্বে প'ড়ে দু ভাগ হ'ল, তা থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলো। রাজা, শান্তনু তাদের দেখতে পেয়ে কৃপা ক'রে গৃহে এনে সন্তানবৎ পালন করলেন এবং বালকের নাম কৃপ ও বালিকার নাম কৃপী রাখলেন।" —মহাভারত : রাজশেখর বসু।

পিতার আদেশে কৃপীকে বিয়ে করেছিলেন দ্রোণাচার্য। তাদের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা।

২৫, নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য অস্ত্রবিদ্যা লাভের জন্য গিয়েছিলেন গুরু দ্রোণের কাছে কিন্তু নীচজাতি বলে তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন না দ্রোণাচার্য। একলব্য তাঁর পায়ে প্রণাম রেখে বনে চলে গেলেন এবং আচার্যের মৃণ্ময়ী মূর্তি স্থাপন করে তার সামনে শুরু করেন বিদ্যাভ্যাস। একদিন কুরু কুমারগণ গেলেন মৃগয়ায়। সঙ্গে তাদের অনুচর এবং শিকারী কুকুর ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণবর্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিহিত জটাজুটধারী একলব্যের কাছে গিয়ে হাজির হল এবং তাঁকে দেখে শুরু করল বিকট চিৎকার। সাধক একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুঁড়ে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চিৎকার বন্ধ করে দিলেন তৎক্ষণাৎ। কুকুরটি সেই অবস্থায় ফিরে গেল রাজকুমারদের কাছে। তাঁরা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন তাঁর শরনৈপুণ্য দর্শনে। পরে তাঁর কথা জানালেন গুরু দ্রোণাচার্যকে। অর্জুন অনুযোগ জানালেন গুরুকে—আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেনা, কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করলে কেন? বিস্মিত হলেন গুরু দ্রোণাচার্যও। তাঁর এমন কোনও শিষ্য আছে বলে জানতেন না তিনি। অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েই গোপনে একলব্যের কাছে সেই গভীর বনে গেলেন দ্রোণ। একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে করজোড়ে সামনে দাঁড়াল গুরুর। দ্রোণ বললেন, বীর তুমি যদি আমার শিষ্যই তবে গুরু দক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও। এই নিদারুণ গুরু দক্ষিণার কথা শুনেও একলব্য হাসিমুখে সেই আঙ্গুল কেটে গুরুকে দিলেন। তারপর সেই নিষাদপুত্র অন্য আঙুল দিয়ে শরাকর্ষণ করে দেখলেন কিন্তু নিক্ষিপ্ত শর পূর্ববৎ দ্রুতগামী হ'ল না আর। সন্তুষ্ট হলেন অর্জুন। স্বার্থসিদ্ধ হ'ল দ্রোণাচার্যের।

৬. কর্ণ

জন্মের নিমিত্ত কর্ণের মত ভাগ্য বিড়ম্বিত বীরাগ্রগণ্য বীরপুরুষ আর দ্বিতীয় নেই মহাভারতে। উচ্চকূলে জন্মলাভ ছাড়া আর কোনও সদ্‌গুণের অভাব ছিলনা তাঁর। জন্মসূত্রে সূতপুত্র পরিচয়ে তৎকালীন অভিজাত শ্রেণীকর্তৃক প্রতিপদে তাঁর প্রতি যে-জাতীয় অবজ্ঞা বা অবমাননা প্রদর্শিত হয়েছে তা একান্তই মানবতা বিরোধী। কেননা জন্মের জন্য কোনও জাতকই দায়ী নয় কখনও। গণ-কর্মের দ্বারাই অর্জিত হয় সত্যকার পুরুষকার। মহাবীর কর্ণ নিজের মুখেই বলেছেন সেকথা—'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তংহি পৌরুষম্।' তাঁর এই উক্তি সর্বকালে সর্বলোকে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা জানি, শুধু মহাভারতের যুগে কেন, সবযুগেই বহু সংগ্রামী বীরপুরুষের পুরুষকারই ব্যর্থ হয়ে গেছে একমাত্র নীচ কূলে জন্মলাভ হেতু। কর্ণ নিজেই তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। অথচ এর জন্য কেউ যদি দায়ী থাকে তবে তা সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থা—আর কেউ নয়, আর কিছু নয়।

মহাভারতের যুগ থেকে নদীর স্রোতের প্রায় সেই একই ধারায় ঐতিহ্য সমানে বয়ে চলেছে আজও। এই মহান্ ঐতিহ্যের নাম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। জাতি-কূল-মান সমাজ-সভ্যতার অনুকূল না হওয়ার অপরাধে কত যে প্রতিভা অকালে বিনষ্ট হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমান কালেও তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ অনুপস্থিত। ভারতে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত আগে ও পরে ঘটে গেছে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অদ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড। স্বাধীনতার তিনদশক পরেও ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি বাদ বা বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মুহুর্মুহুঃ। হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত ছাড়াও উচ্চবর্ণের হিন্দু কর্তৃক নিম্নবর্ণের হিন্দুনারী ধর্ষণ, হরিজন নিধন, তপশীলী জাতি বা উপজাতির উপর অকথ্য অত্যাচার—উৎপীড়ন আজও অব্যাহত। বস্তুতঃ বর্ণবৈরিতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কঠিন ভিতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই সামাজিক সাম্য বা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সনাতন সংস্কৃতির অনাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ নেই বর্তমানকালের মানুষেরও। স্বাধীনতা সংগ্রামী বহু জননেতারই এককালে ধারণা ছিল যে, স্বাধীনতার পর আইনের

চোখে সমানাধিকার অর্জন করবে সাধারণ মানুষ, প্রশ্ন থাকবে না জাত-পাতের। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে তার বিপরীত। গণতন্ত্র আজ গালভরা বুলি মাত্র। স্বাধীনতার সাঁইত্রিশ বৎসর পরেও তার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। স্বরাজের প্রশ্নে একদা ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা গান্ধীজী। একথা অনস্বীকার্য যে, রাজা রামচন্দ্র ছিলেন আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিভূ। শূদ্রের সাধনায় যিনি বিচলিত হয়ে নির্দ্বিধায় শিরশ্ছেদ করেছিলেন তপস্যারত সাধক শম্বকের। সেকালের শাস্ত্রমতে শম্বক অপরাধী। কেননা শূদ্রের অধিকার নেই তপশ্চর্যায়। ব্রাহ্মণের অভিযোগ অনুযায়ী শূদ্র শম্বকের শাস্তিদানই রাজধর্ম। সেই রাজধর্ম পালনে সত্যনিষ্ঠ রামচন্দ্রের হাত কাঁপেনি এতটুকু। রামের সঙ্গে তর্ক করার অবকাশ পাননি সাধনক্লিষ্ট শম্বুক। 'আমি জাতিতে শূদ্র'—এই সত্য কথাটি তাঁর মুখ থেকে বেরোবার সাথে সাথে রামের নির্মম খড়্গ দেহ থেকে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে নিমেষে। এ-হেন রামচন্দ্রের আদর্শ রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা গান্ধীজীর পক্ষেই ছিল সম্ভব। ১৯২১ সালের কথা। নিজেকে একজন সনাতন হিন্দু বলে ঘোষণা করেছিলেন গান্ধীজী। শাস্ত্রানুযায়ী হিন্দুর অবতারবাদ পুনর্জন্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম ইত্যাদি মেনে নিয়েছিলেন তিনি। আবার হরিজনের সপক্ষে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আমরণ। যে-কারণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাময়িকভাবে জনজাগরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি।[১]

লোকলজ্জা বা সামাজিক শাস্তির ভয়ে জন্মক্ষণে কানীন পুত্র কর্ণকে অশ্ব নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন জননী কুন্তী। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যার এ-এক চরম অভিশাপ বৈকি! ঘটনা থেকে একথা অন্ততঃ পরিস্কার যে, সে-যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষেত্রজ-গূঢ়জ সন্তানাপেক্ষা জারজ বা সহোদজ সন্তানের জন্মদান ছিল অতীব নিন্দনীয়। আমরা জানি, জারজ পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকেও জন্মের পরে পরিত্যাগ করেছিলেন জননী সত্যবতী। কিন্তু পিতা পরাশর কর্তৃক পুত্রের পরিচয় প্রদানে শতদোষ খণ্ডন হয়ে গিয়েছে তর্কাতীত ভাবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিতৃ পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়। মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মাতার। প্রসঙ্গক্রমে জবালা-সত্যকাম কথা স্মরণীয়। ঋষি গৌতমের আশ্রমে গিয়েছেন জবালা-পুত্র বালক সত্যকাম। ব্রহ্মবিদ্যালাভে তাঁর অভিলাষ। প্রথানুযায়ী ঋষি গৌতম জিজ্ঞাসা করেছেন তাঁর গোত্র-পরিচয়।

কেননা ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানেরই। বালক সত্যকাম দিতে পারেনি তার গোত্রের পরিচয়।[২] ঘরে ফিরে তাই সে প্রশ্ন করেছে তার মাকে—"মাতঃ, কী গোত্র আমার।" জননী জবালা তার উত্তরে নত মুখে জানিয়ে ছিলেন— "· ····যৌবনে দারিদ্র্য দুখে

বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে ;

জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে ;

গোত্র তব নাহি জানি, তাত।"[৩]

বালক সত্যকাম গুরু গৌতমকে হুবহু তার মায়ের জবানীতে জানিয়েছে সেই গোত্র-বার্তা। তখন আশ্রমবাসি ছাত্রগণ লজ্জাহীন অনার্য বালকের স্পর্ধায় ধিক্কার দিয়েছে সরবে, নীরবে হেসেছে তাচ্ছিল্যের হাসি। কিন্তু ঋষি গৌতম বালক সত্যকামকে গাঢ় আলিঙ্গনে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিলেন—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"[৪]

বৈদিক যুগের অনেক পরে মহাভারতের যুগ। কাজেই জবালার পক্ষে যা বলা সহজ ছিল কুন্তীর পক্ষে তা বলা সম্ভব ছিল না আদৌ। যদিও প্রথম সন্তানের জন্মকথা গোপন রেখে সত্যবতীর মত কুমারী কন্যাই থেকে গিয়েছেন কুন্তী তথাপি সন্তানের বৈধতার পরিচয় অভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে হয়েছে অনিবার্যরূপে। অবৈধ সন্তানের জন্মদানের কারণে শূদ্রা রমণী সত্যবতীকে আমরণ কোনও অনুতাপ করতে হয়নি ক্ষত্রিয়া নারী কুন্তীর মত। কেননা, পুত্রের পিতৃ-পরিচয় স্বীকৃত হওয়ায় গান্ধর্ব বিবাহের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে পরাশর-সত্যবতীর অবৈধ মিলন।

কর্ণের প্রকৃত নাম 'বসুষেণ'। 'বসু' অর্থে সোনা। জাতকের শরীরে বিশেষ কোনো সোনালী চিহ্ন বিদ্যমান থাকায় তাঁর নামকরণ হয়েছিল বসুষেণ। সম্ভবতঃ কোনও জড়ুল চিহ্ন। মহাভারতকার অবশ্য তার গালভরা নাম দিয়েছেন 'কবচ'। কবচ বলতে বুঝি গাত্রবর্ম। অথচ দেহচর্মের অর্থাৎ জন্মদিনের পোশাক ভিন্ন অদ্যাবধি কোনো মানবসন্তান অন্য কবচ-কুণ্ডলসহ পৃথিবীতে জন্মেছেন বলে জানা নেই আমাদের। আসলে এগুলি রূপকার্থে ব্যবহৃত।[৫]

মহাধনুর্ধর মহাবীর কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে মহাভারতে যে-কাহিনী বর্ণিত আছে তা থেকে জানা যায় যে, কুন্তিভোজের পুত্রিকাপুত্র পৃথা পিতৃগৃহে 'কন্যাকাবস্থায় ব্রাহ্মণ সেবায় ও অতিথি পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সর্বত্র যত্নসহকারে পরিচর্যাদ্বারা অভ্যাগতদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। একদা

ধার্মিকাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী, জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আতিথেয়ী কুন্তী ভক্তিযোগসহকারে ও পরম সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি নির্বাহ করিলে, মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিয়া ছিলেন, "বৎসে! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাব বলে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।" মুনিবর এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর কুন্তী বালস্বভাব-সুলভ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষিদত্ত মন্ত্রদ্বারা সূর্যদেবকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে অশেষ ভুবন দ্বীপ-দীপক ভগবান তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন· ····ইত্যাদি ইত্যাদি।[৬]

মহাভারতে নর-নারীর অবৈধ মিলনের প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। স্ত্রীলোকেরা ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে যে-কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারতেন তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে এক আদিপর্বেই। বিবাহের আগে গর্ভোৎপত্তির উজ্জ্বল উদাহরণ স্বয়ং কুন্তী। আসলে কুমারী কন্যার গর্ভধারণ কোনও আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় কোনকালেই। নিতান্তই জৈবিক ব্যাপার। আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে ইচ্ছামত সন্তানোৎপাদনের অলৌকিক বরদান। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বরদান যদিও বরদাতার স্বাধীন ইচ্ছা বা ক্ষমতার প্রকাশ তথাপি কিছু প্রশ্ন থেকে যায় ক্ষেত্রবিশেষে। দান-গ্রহণের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান না ঘটলে বর হয়ে ওঠে অভিশাপ। যেমনটি ঘটেছে কুন্তীর ক্ষেত্রে। কেননা বর হচ্ছে শাপের উল্টো পিঠ। "শাপ দেওয়ার ঘটনার মধ্যে শাপ দাতার যে অবিবেচনা, হঠকারিতা আর নীতিহীনতা প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রকাশ পেত, বরদানের ক্ষেত্রেও নীতির দিক থেকে কোন উন্নততর মান লক্ষ্য করা যেত না। শাপদাতারা যেমন ছিলেন একধরণের অতিমানব—যাঁরা কারও কাছে কোন নৈতিক জবাবদিহির তোয়াক্কা রাখতেন না—বরদাতারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জমিদাররা মাতাল অবস্থায় যেমন মুহূর্তের উত্তেজনায় কারও সর্বনাশ করতেন, আবার কাউকে রাজাবাদশা বানিয়ে দিতেন, বরদান এবং শাপ-দানের ব্যাপারে ঐ অতিমানবদের ব্যবহার ছিল একই রকমে আতিশয্য দোষে দুষ্ট।"[৭]

রামায়ণ মহাভারতে কথায় কথায় ব্যবহৃত 'সেবা', 'সন্তুষ্টি', 'বরদান',

'অভিশাপ' ইত্যাদি শব্দগুলি অনেক সময়ই আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে ভালমত। সদুদ্দেশের পরিবর্তে দেখা দেয় অসদুদ্দেশ্য। অত্রস্থলে কুন্তীর সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে সানন্দেই বরদান করেছিলেন দুর্বাসা। ধ্যানযোগে পৃথার সন্তান ধারণে প্রতিবন্ধকতার কথা জানতে পেরে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তিনি।[৮] অতএব স্বেচ্ছায় ভক্তিমতী পৃথাকে অমোঘ এক আকর্ষণী মন্ত্র প্রদান করেছিলেন মুনিবর যার প্রভাবে যে কোনও দেবতাকে আধুনিক কালের বেতার যন্ত্রের (Wireless) মত আহ্বান করা চলে মুহূর্তে। মন্ত্রশক্তির কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, কুন্তী কি ভুলেও কখনও প্রজনন শক্তির বর প্রার্থনা করেছিলেন দুর্বাসার কাছে? মহাভারতের কাহিনীতে কোথাও কুন্তীর বর প্রার্থনার খবর জানা নেই আমাদের। তাহলে যে-বর প্রার্থনা করেননি কোনও বরপ্রার্থিনী তার জন্য কেন দায়ী হবেন তিনি? আমাদের মনে তাই প্রশ্ন জাগে—একি বরদান, না অভিশাপ প্রদান? কেননা যে-বর উপযাচক হয়ে প্রদান করেছেন দুর্বাসা এবং যার ফলে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে কুন্তীর জীবন তার জন্য আমরা দায়ী করব কাকে?

অনন্তর মহাকর্ষণী মন্ত্র প্রদানান্তে মুনিবর 'প্রস্থান করিলে পর কুন্তী বালস্বভাব সুলভ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষিদত্ত মন্ত্রদ্বারা সূর্যদেবকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্র বলে অশেষ ভুবন, দ্বীপ-দীপক ভগবান তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত হইয়াছি, কি করিতে হইবে, বল?" কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন'···ইত্যাদি গল্পকথা শ্রবণান্তে বা পঠনান্তে আমাদের মনে ফের প্রশ্ন জাগে—কে এই সূর্যদেব? প্রতিদিন আমরা যে প্রাণের দেবতা সূর্যদেবকে জানি, সকালে উঠে যাকে 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্" বলে প্রণাম জানাই, ইনি সেই অগ্নিপিণ্ড সূর্যদেব নন্ নিশ্চয়ই। তা যদি হ'ত, তাহলে আহ্বানকারিণী পৃথা এবং পৃথ্বী দুইই পুড়ে ছাই হয়ে যেত নিমেষে। কাজেই মানবরূপী দিব্যকান্তি এক হিরণ্ময় পুরুষের আবির্ভাবকে কল্পনা করে নিতে হয় আমাদের। কেননা, "ভারতীয় সূর্যোপাসনা জড় অগ্নিপিণ্ডের উপাসনা নয়। ভারতীয় ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে তেজঃশক্তিরূপী সূর্যাগ্নি সকল প্রাণের উৎস—প্রাণময় —সর্বেশ্বর ব্রহ্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা। তাই তারা আদিত্যের অত্যুজ্জ্বল তেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন এক হিরণ্ময় পুরুষ যিনি সূর্যের অন্তরস্থ পুরুষ— যিনি সর্ব্বচেতনার উৎস।"[৯]

প্রশ্নের নিরসন হয় না তবু। মানবরূপে সশরীরে স্বয়ং সূর্যদেব এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, না-কি সূর্যদেবের নামে কোনও তেজস্বী পুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন অকুস্থলে? কুন্তী পিতৃপক্ষের ভয়ে, লজ্জায় এবং কুমারীত্ব নাশের কারণে সূর্যের সঙ্গে মিলনে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করা সত্বেও ক্ষান্ত হননি তিনি। একজন সাধারণ প্রেমিকের মত অনেক কাকুতি-মিনতির শেষে ভীতি প্রদর্শনে রমণে বাধ্য করেছেন মর্ত্ত্যের এক অসহায় কুমারী কন্যাকে।[১০] এতে দৈবী মহিমা ক্ষুন্ন হয়েছে নিঃসন্দেহে।

মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষার কারণে সূর্যের আবির্ভাব এবং আচরণকে নয়, কুন্তীর কৌতূহলকেই এক্ষেত্রে দায়ী করা হয়েছে প্রধানতঃ। অধিকন্তু তার ব্যবহারকে বালস্বভাবসুলভ আখ্যা দিয়েছেন মহাভারত অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ। যাই হোক, বালস্বভাবসুলভ কুন্তী বালিকা ছিলেন না কোনমতেই। কেননা, কুন্তীকে মন্ত্রদানের পর মহর্ষি বলেছিলেন—

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণা বাহয়িষ্যসি।
তস্য তস্য প্রসাদাত্বং দেবি পুত্রান্ জনিষ্যসি॥

—হে দেবি, এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার অনুগ্রহে পুত্র লাভ করিবে।[১১]

দুর্বাসার 'দেবী' সম্বোধন ও কুন্তীর আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, কুন্তী তখন নিতান্তই বালিকা নন, যৌবনে পদার্পণ করেছেন একান্তই।

অতঃপর নিজ কৃতকর্মের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সকাতর অনুনয় করে বলেছেন কুন্তী—"আপনাকে আহ্বান করিয়া অতি মূঢ়ের কার্য করিয়াছি, আমার অপরাধ হইয়াছে, ভগবন্! এক্ষণে চরণ ধরিয়া বিনয়পূর্বক প্রার্থনা করিতেছি, কৃপাময়! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জনা করুন। স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম।"[১২] কিন্তু কুন্তীর আবেদনে কর্ণপাত করেননি কঠোর হৃদয় সূর্যদেব। অশেষ ছলনায় চরিতার্থ করেছেন কামপ্রবৃত্তি। সর্বনাশ করেছেন এক কুমারী কন্যার। এতে তার দৈবী মহিমা ক্ষুন্ন হলেও ক্ষতি হয়নি কোনও। অতএব অবলীলাক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করেছেন দেবতা। অথচ আমরণ তাঁর বীর্যশুল্কের অপরিমিত ঋণ শুধতে হয়েছে কুন্তীকে। একান্তই নিঃশব্দে। জগৎ সুমুখে একটিবারও তিনি মুখ ফুটে বলতে পারেননি তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মকথা। বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও কাউকে জানাতে পারেননি সেই সন্তানের বিসর্জন বার্তা। জানাতে পারেননি

তাঁর প্রথম সন্তানের প্রকৃত জন্মদাতাই বা কে? কুন্তীর জীবনে চরম দুর্ভাগ্য যে, তাঁর বৈধ সন্তানদেরও প্রকৃত জনকগণের পরিচয় দিতে পারেননি কখনও। যদিও আমরা জানি, তাঁর প্রথম বৈধ পুত্রের জন্মকথার গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে গেলে হস্তিনার রাজসিংহাসনের দাবীদারই হতে পারতেন না যুধিষ্ঠির। নির্ব্বিবাদে রাজা হতেন দুর্যোধন। ভীমার্জ্জুনের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ পেলেও নষ্ট হয়ে যেত রাণী কুন্তীর ভাবমূর্ত্তি। এমতাবস্থায় দেবতাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাঁর।

শত দুঃখেও মহাপ্রজ্ঞা, মনস্বিনী এবং অশেষ ধৈর্যশীলা রাজ্ঞী কুন্তীর বাক্-সংযম সাতিশয় বিস্মিত করে আমাদের। মহাভারতের মহাবীর পাণ্ডবগণের মহীয়সী জননী এই বীরাঙ্গনা নারীর অন্তর্বেদনা বাক্স্ফূর্ত্তি লাভ করেছে কদাচিৎ। আমরা এও দেখেছি, যখনই তাঁর অন্তহীন অন্তর্বেদনা আগ্নেয়গিরির মুখ নিয়েছে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় তখনই শুধু তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে অসীম গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাদি। যদিও তা পরিমাণে যৎসামান্য এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে উদ্‌যোগপর্বে একবার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণের কাছে দুঃখের ডালি মেলে ধরেছিলেন তিনি। আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'হে পরন্তপ, সেই আমি পিতার দ্বারা পিতৃস্নেহ বঞ্চিতা এবং শ্বশুরকুলেও ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্রাদির দ্বারা লাঞ্ছিতা। এমন অতি দুঃখের জীবনধারণে আমার আর কি প্রয়োজন, হে কৃষ্ণ?'[১৩] সারা জীবন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হয়েও যিনি ধৈর্য্য হারান নি এতটুকু সেই কুন্তীই যুদ্ধের উদ্যোগ নিতে পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—'হে গোবিন্দ, বৈধব্য, অর্থহানি, দুর্যোধনকৃত শত্রুতা ইত্যাদিতেও তত বিচলিত হই নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল পুত্রগণের অদর্শনে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি আমি। মৃত্যু শোকেও মানুষের সান্ত্বনা আছে কিন্তু এই শোকের কোনও সান্ত্বনা নেই, তুমি ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলবে যে তার ধর্ম ক্ষীণ হচ্ছে। যে পুত্রবতী নারী অপরের আশ্রয়ে বাস করে সেই নারীকে ধিক! ভীম ও অর্জ্জুনকে বলবে যে, ক্ষত্রিয়া নারী যে উদ্দেশ্যে পুত্রকামনা করেন, তারা যেন সেই উদ্দেশ্য সফল করে। তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত।' .....এতসব দুঃখের কথা বলা সত্ত্বেও কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে তাঁর দাম্পত্য জীবনের কোন কথা মুখ ফুটে বলেননি তিনি। হয়তো অশোভন বলেই বলেননি তা। আর লজ্জাকর বলে বলতে পারেননি কর্ণের জন্মকথা এবং তাকে বিসর্জন দেবার বৃত্তান্ত। তথাপি আমরা জানি, পুরুষত্বহীন পাণ্ডব আনন্দোজ্জ্বল মুখের ছবি কখনো দেখতে পাননি

কুন্তী।[১৪] জননী হিসাবে সার্থক হলেও স্বামী বর্তমানে ক্ষেত্রজ পুত্র গর্ভে ধারণ করা সুখের বা সৌভাগ্যের ছিল না কোনও ক্ষত্রিয়া নারীর পক্ষে। কর্ণের মত দেব-শিশুকে বুকে করে বিসর্জন দেওয়া ছিল আরও মর্মান্তিক। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত সেই সন্তানের জন্য তাঁর মমতা ছিল অপার অগাধ। কাজেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের হাতে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু অবধারিত জেনে কর্ণের সেনাপত্য গ্রহণের পূর্বক্ষণে দানবীর পুত্রের কাছে নগ্নপদে ভিক্ষা মাগতে গিয়েছিলেন তিনি। নিদারুণ লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছিলেন তাঁর জন্মকথা। পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন সস্নেহে। বিচলিত হয়েছিলেন কর্ণ। কিন্তু সে মুহূর্তে কুন্তী অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললেন—তুমিই হবে রাজা। 'নিঃসপত্ন রাজ্য-মাঝে রত্ন-সিংহাসনে' বসবে তুমি। যুধিষ্ঠির নয়—সেই মুহূর্তেই কর্ণের মনে জেগেছে ঘোর সন্দেহ। অভিমানাহত কণ্ঠে বলেছে যে—"সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহ পাশ/তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস।"[১৫] এখানে প্রশ্ন ওঠে, বাঙ্ময় হয়ে ওঠে আমাদেরও মৌন জিজ্ঞাসা—সত্যই কি পাণ্ডব-জননীর স্বার্থবুদ্ধি প্রকট হয়ে উঠেছিল সেদিন? না কি "বঞ্চিত যে ছেলে/তারি তরে" চিত্তে দীপ্ত দীপ জ্বেলে ছুটে গিয়েছিলেন পুত্রের কল্যাণ কামনায়? এ প্রশ্নের উত্তর আপাতত থাক্। কেন না সকলের মনেই রয়েছে এখনো সন্দেহের অবকাশ।"[১৭] যাই হোক ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলেন কুন্তী। কিন্তু যে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাঁর পুত্রের তাও অর্দ্ধসত্য। সত্য বটে, অধিরথ সুতপুত্র রাধার তনয় ছিলেন না কর্ণ, কুন্তীই তাঁর জননী কিন্তু পিতা কে? দেবতার দোয়া বা দয়ায় আজও মর্ত্যের জনক-জননী সন্তান লাভ করেন এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে সত্য, দেবতার নামে নামকরণ হয় সন্তানের, তাই বলে মহাদেবের দুয়োর ধরা ছেলে মহাদেবেরই ঔরসজাত বলে গণ্য হয় না কখনও।

আধুনিক কালের নীতিবোধ অনুযায়ী মহাভারতের যুগের যৌন-জীবনযাপনের নৈতিক মান ছিল বহুলাংশে শৈথিল্যসূচক। এ যুগে যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রশংসনীয়, সে যুগে ছিল সন্তানোৎপাদন। তথাপি আরোপিত হয়েছিল কিছু বিধি-নিষেধ। নর-নারী উভয়ের পক্ষে সে যুগে বিবাহ ছিল অবশ্যকরণীয় সামাজিক কর্ম। আমরা জানি কোন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো হল তার আসল বনিয়াদ। "এই বনিয়াদের ওপরেই গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনীতিগত উপরি-কাঠামো; এই বনিয়াদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সমাজ-চেতনার বিশেষ রূপগুলি আকার নেয়।"[১৭] মহাভারতের যুগে প্রয়োজন ছিল লোকবলের।

সে-কারণে পুত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় নিয়মকানুনের শৈথিল্য। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ক্ষেত্রজ-গূঢ়জ-সহোঢ়জ ইত্যাদি দ্বাদশ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়—যার প্রয়োজন এ যুগে অবসিত।[১৮] যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য। তাঁরই রচনা বাজসনেয় সংহিতা বা শুক্ল যজুঃ। ঘটনা পরিক্রমায় এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, কুমারী কন্যার সন্তানলাভ সে যুগে অতীব নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল সমাজে। অথচ বৈদিক যুগে তেমন নিন্দনীয় ছিল না। 'কন্যাত্ব দূষিত হবে না' বলে আদিত্যদেবের বরদান সত্ত্বেও তার উপর নির্ভর করতে পারেননি কুন্তী। পিতার শাসন ও লোকলজ্জার কারণে ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে জলসহ একটি বড় পেটিকায় করে অশ্বনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন সদ্যোজাত দেবদ্যুতি পুত্রকে। নদীর স্রোতে ভাসমান নিশ্ছিদ্র পেটিকাটিকে চোখের জলে বিদায় জানাতে গিয়ে সদ্যোজাত শিশুর কল্যাণ কামনায় স্বস্তিবচন পাঠ করেছেন কুন্তী—

"স্বস্তি তে চান্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রম।
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে॥ বন-৩০৭/১০-২১
ইত্যাদি

অর্থাৎ—বৎস, অন্তরিক্ষগত, পৃথিবীগত এবং দেবলোকগত প্রাণিগণ থেকে তোমার মঙ্গল হোক। জলচর প্রাণিগণও তোমার কল্যাণ করুন। তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক, কেউ যেন তোমাকে হিংসা না করে ইত্যাদি।

যশস্বিনী কুন্তী সারা জীবনে শান্তি পাননি কোনোদিন। শত দুঃখের মাঝে সন্তানরাই ছিল তাঁর সান্ত্বনা। তাই তাঁর কাছে স্বামী নয়, সংসার নয়, সিংহাসন নয়—পুত্রগণই সব, পুত্রগণই সর্বস্ব। পুত্রগণের কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এ-প্রমাণ একবার নয়, বারবার পেয়েছি আমরা। উদ্‌যোগ পর্বে কৃষ্ণকে বিদায় জানাবার মুহূর্তে বলেছেন তিনি—'হে মহাবাহো, যাতে পুত্রগণের কল্যাণ হয়, তুমি তাই করবে। তোমার বুদ্ধি, বিক্রম ও প্রভাব আমি ভালভাবেই জানি, তুমিই আমাদের পরম আশ্রয়।', যিনি যুদ্ধের জন্যই দূত মাধ্যমে প্ররোচিত করেছেন পুত্রদের সেই তিনিই আবার পুত্রগণের অমঙ্গল আশঙ্কায় যুদ্ধবন্ধের আশায় ছুটে গেছেন কর্ণের কাছে। যদিও তা ফলপ্রসূ হয়নি। সংঘটিত হয়েছে যুগান্তের লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ। সত্য প্রমাণিত হয়েছে কর্ণের প্রতিশ্রুতি। পঞ্চপুত্রেরই জননী রয়ে গিয়েছেন তিনি। নিহত হয়েছেন কর্ণ।

তথাপি শান্তি নেই। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে সমবেত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-বিদুর-কুন্তী এবং পাণ্ডবগণসহ হস্তিনাপুরীর অন্যান্য জীবিতগণ। হতবান্ধবা মহিলাগণের করুণ ক্রন্দনে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে কুরুক্ষেত্রের আকাশ-বাতাস। তারই মধ্যে স্তূপীকৃত হয়েছে ছিন্নভিন্ন শতসহস্র শবদেহ। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে এবং বিদুরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে শবদেহসমূহের দাহক্রিয়া। তারপর মৃত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে গঙ্গায় গিয়েছেন সকলেই। এমন এক মুহূর্তে আর আত্মসংবরণ সম্ভব হয়নি কর্ণহারা কুন্তীর পক্ষে। যে পুত্রের নিমিত্ত এতদিন তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছেন তিনি সেই পুত্রের জন্য এই সর্বপ্রথম সর্বসমক্ষে হাহাকার করে জানালেন পুত্রগণকে—বৎসগণ, যে মহাবীরকে তোমরা এতদিন রাধার তনয় বলে জানতে…সেই পুণ্যকর্মা ছিলেন তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সূর্যদেব থেকে আমারই গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁর উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর।' অতএব যদি মাত্র পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতিই তাঁর মমত্ব বিদ্যমান থাকত তাহলে নিহত পুত্রের জন্য প্রয়োজন ছিল না শোক প্রকাশ ও স্বীকারোক্তির।[১৭] আর যুধিষ্ঠিরের অভিসম্পাতও কুড়াতে হত না সমগ্র স্ত্রীজাতিকে।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পনের বছর পরও বলা যেতে পারে হস্তিনার রাজ-পরিবারের সকলেই তখনও প্রায় জীবন্মৃত এবং মহাশ্মশানবাসী। শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছে অনুক্ষণ। বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী। তাঁদের সেবায় সঙ্গে চলেছেন কুন্তী। সকলেই হতবাক্। হতবাক্ আমরাও। যে-কুন্তী বিদুলার উপাখ্যান কীর্তন করে পুত্রগণকে উত্তেজিত করেছেন যুদ্ধের জন্য সেই কুন্তীই চলেছেন শেষ জীবনের বনবাসে। যুধিষ্ঠির কর্তৃক এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে প্রত্যুত্তরে বলেছেন কুন্তী—'পুত্রের বিজিত রাজ্যে ঐশ্বর্য-ভোগের স্পৃহা আমার নেই। হে মহাবাহো, তপস্যা দ্বারা আমি পুণ্য পতিলোক লাভের কামনা করি। অরণ্যবাসী ভাশুর ও ভাশুর-পত্নীর সেবায় ক্লেশিত করবো নিজেকে।[১৯] সাশ্রুনয়না কুন্তী পথ চলতে চলতে মৃতপুত্র কর্ণকে স্মরণ করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—বুদ্ধির দোষে একদিন যাকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম তোমাদের সেই বীর্যবান জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে স্মরণ করবে সর্বদা। সূর্যতনয় বীরপুত্রের পরিচয় গোপন করেছিলাম বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছি। আমার কঠিন হৃদয়ও শত ধা বিদীর্ণ হয়ে যায় শোকে।

কিছুদিন পর ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ বাণপ্রস্থিগণের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় যুধিষ্ঠির অরণ্য

যাত্রা করেছেন সপরিবারে। ততদিনে মহাপ্রয়াণ করেছেন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর। শতযুপের আশ্রমে সমবেত হয়েছেন সকলে। এসেছেন মহর্ষি ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ প্রমুখ তপস্বিগণ। পরলোকগত পুত্র-জ্ঞাতিবন্ধুবর্গের গতি কিরূপ হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করবার নিমিত্ত শ্বশুর ব্যাসদেবের চরণে প্রার্থনা জানালেন গান্ধারী। গান্ধারীর প্রার্থনা শুনে কুন্তীরও মনে বাসনা জেগে উঠল মৃতপুত্র কর্ণকে দেখবার জন্য। তপস্বিনী কুন্তীর তখন আর লোকলজ্জার বালাই ছিল না। ব্যাসদেবকে প্রণাম জানিয়ে জীবনের সকল ঘটনা বলতে শুরু করলেন তিনি। সমস্ত সহের সীমা পেরিয়ে এসে শেষ জীবনে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম প্রসঙ্গে যে ইঙ্গিত দিলেন আজীবন বাকসংযতা কুন্তী তাতেই আমরা চমকে উঠি ভীষণ। সেই কুমারী বয়সে দুর্বাসার পরিচর্যা বিষয়ে বলতে গিয়ে দীর্ঘকালের কি গোপন রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে দিলেন সহসাই। বললেন—'আমি অপাপবিদ্ধ শুদ্ধচিত্তে গোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্বাসার পরিচর্যায় পরিতুষ্ট করেছিলাম তাঁকে। তপস্বীর আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ সত্ত্বেও কদাচ ক্রুদ্ধ হয়নি আমি।[20] এখানেই আমাদের মনে ঘনীভূত হয়ে ওঠে এতদিনের বাষ্পাকারে ভাসমান সেই জটিল জিজ্ঞাসা—উগ্রতপা তপস্বী দুর্বাসা কি এমন অসদাচরণ করেছিলেন কন্যাসমা রাজপুত্রীর সঙ্গে যাতে তাঁর বিশেষ ক্রোধের কারণ ঘটতে পারে? যদিও এ-বিষয়ে কুন্তী আর কিছু বলেননি বটে এবং বলারও বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না আমাদের। কেননা এই দুর্বাসাই তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তোলা সত্ত্বেও মর্যাদার প্রশ্নে অশেষ ধৈর্য ধরেছেন তিনি। এরপরেও কি আর খুলে বলার প্রয়োজন থাকে যে, উগ্রতপা বা সূর্যতপা দুর্বাসা মুনিই সূর্যের সাক্ষাৎ প্রতিভূ? তিনিই ছিলেন কর্ণের প্রকৃত জন্মদাতা? তাঁর মন্ত্রপ্রদান তাবৎ লোককে বোকা বানানো ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকানেক মুনি-ঋষিদেরই এমন আত্মসংযমের চূড়ান্ত অভাব সত্ত্বেও তাঁদের অপকীর্ত্তিকে চাপা দেওয়া হয়েছে শ্রেণীস্বার্থে। সম্ভবতঃ এ-কারণেই কুন্তীর অশেষ ধৈর্যের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন স্বয়ং ব্যাসদেব।

কর্ণের জন্ম প্রসঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে জননী কুন্তীর চরিত্র। লোকলজ্জার খাতিরে যে-শিশুকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সমাজের পঙ্কিল স্রোতে, ধাপে ধাপে সেই লোক-লজ্জার বেড়া ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রখর সূর্যালোকে সত্যের আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন তিনিই। সন্তানহারা মাতৃহৃদয়ের মর্মব্যথা মহাভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে চোখে আঙুল

দিয়ে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেছে আমাদের। কুন্তী-চরিত্রের উত্তরণ তাই সূত্রাকারে বলা যেতে পারে, যথা—(এক) কর্ণের জন্মমুহূর্তে পিতৃপক্ষের ভয়ে, লোক-লজ্জায় এবং কুমারীত্ব নাশের কারণে অনন্যোপায় কুন্তী জলে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর প্রথম সন্তানকে। এজন্য সে-যুগের সমাজ ব্যবস্থাই মূলতঃ দায়ী। (দুই) হস্তিনার রাজপুরীতে অস্ত্রপরীক্ষার আসরে পরিত্যক্ত পুত্রের অবমাননায় হতচেতন হয়েছিলেন কুন্তী কিন্তু কোন কথা প্রকাশ করতে পারেননি সেদিন। (তিন) ভ্রাতৃ-বিরোধ প্রতিরোধ সলজ্জ কুন্তী কর্ণের কাছে তাঁর জন্মসত্য প্রকাশ করেছেন প্রথম, তাও অর্ধসত্য। (চার) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরই সর্বসমক্ষে সর্বপ্রথম কর্ণকে আপন গর্ভজাত পুত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন কুন্তী এবং তর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরাদিকে। (পাঁচ) আশ্রম-বাসিক পর্বে এসে সমস্ত লোকলজ্জা, নিন্দা, ভয় ইত্যাদির বাইরে দাঁড়িয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণের প্রকৃত জন্মদাতার পরিচয় দান করেছেন ইঙ্গিতে। যদিও রাজ্ঞী কুন্তী এবং জিতেন্দ্রিয় দুর্বাসার ভাবমূর্তি রক্ষায় শ্রেণীস্বার্থে সেই সত্য প্রচারে বিমুখ হয়েছেন ব্যাসদেব। পক্ষান্তরে সঠিক জন্ম পরিচয়ের অভাবে নিজের জীবনে অপরিসীম সামাজিক ঘৃণা আর বঞ্চনার মাশুল জোগাতে হয়েছে কর্ণকে। অথচ জ্ঞানে-গুণে, দানে-ধ্যানে কোনক্রমে পাণ্ডবগণের চাইতে ন্যূন ছিলেন না তিনি। কিন্তু জন্মক্ষণে মাতৃ পরিত্যক্ত, কুল-কৌলিন্য বঞ্চিত এই মহাধনুর্ধর বীর-পুরুষও অশেষভাবে লাঞ্ছিতও হয়েছেন লোকসমাজে। জন্মই তাঁর ব্যর্থতার জন্য এক-মাত্র দায়ী। অস্ত্রশিক্ষার শুরুতে গুরু দ্রোণের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যালাভে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন শুধুমাত্র উচ্চবর্ণে জন্ম পরিচয়ের অভাব হেতু। আচার্য দ্রোণ তাঁকে বলেছেন যে, দিব্যাস্ত্র শিক্ষালাভে কেবল ব্রাহ্মণ আর সংযমী ক্ষত্রিয়ের অধিকার অপরের নহে।

গুরুর প্রত্যাখ্যান থেকেই কর্ণ চরিত্রে অর্জুন-বিদ্বেষ শুরু। যার পরিণাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত প্রসারিত। আচার্যের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহেন্দ্র পর্ব্বতে মহর্ষি পরশুরামের কাছে গিয়েছেন অস্ত্র বিদ্যালাভে। সেই গুরুর কাছ থেকেও সরহস্য ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যালাভের সাথে পেয়েছেন গুরুতর অভিসম্পাত২১, পরশুরামের এ-রকম অভিসম্পাতের মূলে রয়েছে কর্ণের জন্ম পরিচয়।

হস্তিনায় কুমারগণের শস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার আসরে অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন কর্ণ। কিন্তু আচার্য কৃপ অর্জুনের বংশ পরিচয় দানের পর কর্ণকে বলেছিলেন—তোমারাও বংশ পরিচয় দাও, তারপর তোমার সঙ্গে

দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন অর্জুন।' পার্থের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে-জাতীয় কৌলিন্য থাকা প্রয়োজন সে-জাতীয় বংশ মর্যাদা ছিল না তাঁর। তাঁর পরিচয় শুধু সূতপুত্র রাধার তনয়। অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন কর্ণ। তাঁর গ্লানির কারণ সেই এক বংশ পরিচয়। সূতপুত্র বলে ভীমের বিদ্রূপের সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন দুর্যোধন— "কথামাদিত্য সদৃশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি।"—আদিত্য তুল্য এই পুরুষ শার্দ্দিলের জননী কি কখনও মৃগী হতে পারে ?

জন্মের কারণেই দ্রুপদরাজ দুহিতা কৃষ্ণার স্বয়ংবর সভায় অপমানিত হয়েছিলেন কর্ণ। সমাগত রাজা, রাজপুত্রগণ এবং রাজন্যবর্গ সকলেই লক্ষ্যভেদে অকৃতকার্য। তখন মহাবীর কর্ণ ধনুকে জ্যা রোপন করতে না করতেই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন দ্রৌপদী—'আমি সূতপুত্রকে বরণ করবো না।" কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও অধিকার ছিল কি কৃষ্ণার ? তিনি তো লক্ষ্যভেদে বিজয়ী বীরের গলায় বরমাল্য অর্পন করবেন বলেই স্থির প্রতিজ্ঞ। উপস্থিত রাজন্যবর্গ এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেননি কেউ। একবার শূন্য পানে তাকিয়েই নতশিরে নেমে এসেছেন কর্ণ। তাহলে শৌর্য নয়, বীর্য নয়—কুল-কৌলিন্যই বড়। লক্ষ্য ভেদের চাইতে জাত-পাতের বেড়াভাঙ্গাই ছিল কঠিনতম কাজ। বিশেষ করে শূদ্রকুলের। কর্ণের পরিচয় ছিল অধিরথ সূতপুত্র বলে। শূদ্রেরই সমকক্ষ ছিল সূতজাতি।২২ সূতের কর্ম পুরানকথন এবং রথের সারথ্য। মহাভারতের যুগে শূদ্রের সামাজিক অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়।২৩ অনুলোম বিবাহ সমাজে অনুমোদিত হলেও দ্বিজের অর্থাৎ ব্রহ্মাণের পক্ষে শূদ্র-বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ।২৪

কর্ণের জীবনে শেষ এবং চরমতম আঘাত হেনেছেন তাঁর মা কুন্তীই। তবু কোনও অভিযোগ নয়, অভিসম্পাত নয়, আপন দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডব জননী কুন্তীকে। তাঁর উদারতায় বদান্যতায় সামান্যতম ভ্রান্তিরও অবকাশ নেই। ক্ষত্রিয়া রমনী রাজমাতা কুন্তীর কাছে তাঁর একটি মাত্র প্রার্থনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত—

"জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে আমি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই॥"২৫

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১. 'As early as 1921 he (Gandhi) declared himself to be a Sanatanic Hindu. "I call myself a Sanatanic Hindu, because (1) I belive in the Vedas, the Upanishads the Purans and all that goes by the name of

Hindu scriptures, therefore in Avatars anb rebirth (2) I believe in Varnashrama Dharma in a sense in my opinion strictly vedic, but not in its present popular and crude sense etc ..."

This was the ideology of the father of the nation who headed the Gongress during the days of the national anti-imperialist struggle, Inspite of this ideology he could more lakhs for the national struggle an make the momentarily foget their caste distinctions.'

[Caste, class and property Relation—By B. T. Ranadive. Page—3/4]

২। গো-বেষ্টনী থেকেই গোত্র শব্দের উদ্ভব। আর্য ঋষিদের কাছে গরুই ছিল সব কিছু, যেন গোটা পৃথিবীটাই। বৈদিক কবিদের কল্পনা ছিল একান্তই গো বিভোর বা গো-ময়। প্রাক-বৈদিক—বিশেষত সিন্ধু-সভ্যতার-চিন্তাধারার সঙ্গে বৈদিক চিন্তাধারার একটি প্রধান পার্থক্য পুরুষ প্রাধান্য। "পশুপালন নির্ভর সমাজ পুরুষ-প্রধান অতএব পশু পালকদের চিন্তা-চেতনাতেও এই পুরুষ-প্রাধান্যের পরিচয় স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে কৃষি প্রধান অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ ব্যবস্থা মাতৃ-প্রধান।'

—ভারতীয় দর্শন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

দ্রষ্টব্য: বৈদিক সমাজ ও বৈদিক চিন্তাধারা।

৩। ব্রাহ্মণ—রবীন্দ্রনাথ [কবিতাটি 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৪। ঐ

৫। 'শরীরে কবচ এবং কাণে কুণ্ডল লইয়াই বসুষেণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এগুলি সম্ভবতঃ রূপক। অসামান্য রূপ লাবণ্যের অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন—ইহা প্রকাশ করাই বোধ করি এই রূপকের উদ্দেশ্য।'

—মহাভারতের চরিতাবলী। সুখময় ভট্টাচার্য

[বসুষেণ (কর্ণ) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

৬। কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত।
সাক্ষরতা প্রকাশন। প্রথম প্রকাশ। পৃঃ—১১৭।

৭। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন—অশোক রুদ্র।
[কৃচ্ছ্র ও বরদান প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। পৃঃ—১০৪]

৮। তস্মৈ স প্রদদৌ মন্ত্রনাপদ্ধর্ম্মান্ববেক্ষয়া।
অভিচারাভি সংযুক্তমব্রবীচ্চৈব তাং মুনি॥
—আদিপর্ব। পঞ্চাধিকশততমোধ্যায়
—সিদ্ধান্তবাগীশ।

৯। হিন্দুদের দেব দেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ১ম খণ্ড—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
পৃঃ—১১৩। সূর্য প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

১০। অমোঘং দর্শনং মহ্যমাহূতশ্চাস্মি তে শুভে ।। বৃথাহ্বানেঽপি তে ভীরু। দোষঃ সান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ আদি ---১০৫তম অধ্যায়। ২৫ সংখ্যক শ্লোক

অর্থ—সুন্দরি, তুমি যখন আমাকে ডেকেছ তখন তোমার দর্শন আমার পক্ষে অব্যর্থ। ওহে ভীরু, এই আহ্বান ব্যর্থ হলেও তোমার দোষ থেকে যাবে নিঃসন্দেহে।

১১। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারতে পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। তার মহাভারতম্-এ 'দেবি' সম্বোধন নেই। সেখানে আছে ভিন্ন পাঠ। পাঠকের অবগতির জন্য সেই পাঠ তুলে দেওয়া হল--

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।

তস্য তস্য প্রসাদেন পুত্রস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ আদিপর্ব

---পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

এক্ষেত্রে আমি পূর্বোক্ত পাঠ গ্রহণ করেছি সুখময় ভট্টাচার্যের 'মহাভারতের চরিতাবলী' থেকে।

* শ্রীভট্টাচার্য বঙ্গবাসী প্রকাশিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহাভারত অনুসরণ করেছেন।

‡ কুন্তী যে নিতান্তই বালিকা ছিলেন না এ মন্তব্যও তাঁর আমি শুধু তাঁর। সাধু ভাষার রূপান্তর ঘটিয়েছি চলতি গদ্যে। ['পৃথা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃঃ-৫৪৮

১২। কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের অনুবাদ গৃহীত হয়েছে এখানে। 'কুন্তীগর্ভে কর্ণের জন্ম' বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। মহাভারত—সাক্ষরতা প্রকাশন। প্রথম প্রকাশ। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১৭।

১৩। সাহং পিত্রা চ নিকৃতা শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ।

অত্যন্ত দুঃখিতা কৃষ্ণ কিং জীবিত ফলং মম ॥ —উদ্যোগ পর্ব - ৯০।৬৪

পিতা শূরসেন তাকে কুন্তি ভোজের কন্যারূপে দান করায় কুন্তীর মনে গভীর দুঃখবোধ ছিল আমরণ। এজন্য তিনি বলেছেন, 'আমি দুর্যোধনকে বা নিজেকে দোষ দেই না, আমার পিতাকেই আমি নিন্দা করি।'

১৪। কিন্দম মুনির অভিসম্পাতের কথা ভুলে একদা বসন্তকালের নির্জন উপবনে ভ্রমণরত মহারাজ পাণ্ডু মাদ্রীর পুন-পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও উপগত হলেন কনিষ্ঠা পত্নীতে এবং গত হলেন। পাণ্ডুর গতপ্রাণ দেহ আলিঙ্গনাবদ্ধ করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকেন মাদ্রী। তখন পঞ্চপুত্রসহ কুন্তী তথায় উপস্থিত হয়ে মাদ্রীকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—'হে বাহ্লীকি তুমি ভাগ্যবতী, তুমি মহারাজের প্রসন্ন মুখ দেখতে পেয়েছ।'

১৫। কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্রষ্টব্য-কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।

১৬। মূল মহাভারতে আছে, বিদুরের কথায় অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন কুন্তী যুদ্ধ বন্ধের হেতু ছুটে গিয়েছিলেন কর্ণের কাছে। কেননা এই পাপমতি কর্ণই দুর্যোধনের অসাধু কর্মের সমর্থক, এর আচরণও সাধু নয়। কর্ণ সর্বদা পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে এবং পাণ্ডবগণের অহিত সাধনে তৎপর, বিশেষতঃ কর্ণ বলবান। এখন

আমি এই চিন্তায়ই দগ্ধ হচ্ছি। আজই আমি জননীর দাবি নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো॥ মূল শ্লোক যথা—

অয়াস্থকো যথাদৃষ্ট ধার্তরাষ্ট্রস্থ তন্মতেঃ।
মোহানুবর্তী সততং পাপোদ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্॥
মহত্যমর্ষে নিরবন্ধী বলবাংশ্চ বিশেষতঃ।
কর্ণঃসদা পাণ্ডবানাং তন্মে দহতি সম্প্রতি। ইত্যাদি

উদ্যোগপর্ব—১৪৪।১৮-২০ দ্রষ্টব্য

১৭। কার্লমার্কস, "এ কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকনমি।
Source সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে। পৃ ৫

১৮। * ক্ষেত্রজ অর্থে একের স্ত্রীর গর্ভে অন্য ব্যক্তির উৎপাদিত সন্তান।
** গূঢ়জ অর্থে স্বামীর অনুপস্থিতিতে অজ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত সন্তান।
*** সহোঢজ অর্থে বিয়ের আগে গর্ভবতী নারীর সন্তান।
**** জারজ অর্থে গুপ্ত প্রণয়ী বা উপপতির দ্বারা উৎপাদিত সন্তান।

১৭। বৃকরূপমুদকঃ তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্ট কর্মণঃ।
স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত॥ স্ত্রী॥ ২৭।১১

১৮। কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ বিধি সমাপ্তির পর অভিসম্পাত করেছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির—অতঃপর সমগ্র স্ত্রীজাতি কোন কথাই মনে গোপন রাখতে পারবেন না।

১৯। "নাহং রাজ্যফলং পুত্রাঃ কাময়ে পুত্র নির্জ্জিতম্।
পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো॥" ইত্যাদি

—আশ্রমবাসিকপর্ব ১৭।১৯-২০

২০। "শৌচেন ত্যাগযোগেন শুদ্ধেন মনসা তথা।
কোপস্থানেষপি মহৎস্বল্পমাপন্ন কদাচন॥ —আশ্রমবাসিকপর্ব ৩০।৩

২১। 'যেহেতু ব্রহ্মাস্ত্রের লোভে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ সেহেতু মৃত্যুকালে তিরোহিত হবে তোমার ব্রহ্মাস্ত্র-জ্ঞান।'

২২। তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন
---সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা—১১৬।

২৩। ঐ—পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১৭।

২৪। ---"মহাভারতে' শূদ্রের সামাজিক অবস্থা শোচনীয়। অনুলোম বিবাহ অনুমোদিত হলেও দ্বিজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ। — দ্রোণপর্ব ৯৩।৩
—ঐ—পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১৭ অনুশাসন পর্ব ৪৪।১২

২৫। কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭. দুর্যোধন

বিচিত্র জন্মকথার আকর গ্রন্থ মহাভারত। এতাবৎ আলোচনায় তার কিছু হাল হকিকৎ তুলে ধরা হয়েছে সাধ্যমত। দুর্যোধনের জন্মকথা এমনই এক বৈচিত্র্যময় কাহিনী। তাঁর জন্ম কাহিনী সংক্ষেপে এই–একদা মহর্ষি দ্বৈপায়ন সাতিশয় ক্ষুৎ পিপাসায় শ্রমান্বিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন মহর্ষি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলে গান্ধারী কহিলেন "যদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে এইবর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্ত্তার সমান গুণশালী শত পুত্র জন্মে।" ব্যাস 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পর ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সহবাসে গর্ভবতী হলেন গান্ধারী কিন্তু দু'বছরেও তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। ইতিমধ্যে কুন্তীর একটি পুত্র (যুধিষ্টির) জন্মলাভ করেছে জেনে তিনি অধীর ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে নিজের গর্ভপাত করলেন। তাতে লৌহপিণ্ডের ন্যায় কঠিন এক মাংসপিণ্ড ভূমিষ্ঠ হল। গান্ধারী সেই লৌহপিণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হয়ে বললেন, একি করেছ, সৌবলেয়ি ? গান্ধারী তখন তাঁর মনের কথা খুলে বললেন ব্যাসদেবকে— "মহাত্মন ! অগ্রে কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়া এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পূর্ব্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শতপুত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই মাংস-পেশী হইতে শতপুত্র উৎপন্ন করুন।" ব্যাস বলিলেন আমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না। মাংসপেশী নষ্ট কর না। এ থেকেই তোমার শতপুত্র উৎপন্ন হবে। তুমি গুপ্ত কক্ষে শত সংখ্যক কুম্ভ স্থাপন করে এই মাংসপেশীর উপর শীতল জল সেচন কর। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মাংসপিণ্ড শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে অঙ্গুষ্ঠপর্ব প্রমাণ একশ' ভ্রূণ পৃথক হল। তারপর সেই ভ্রূণগুলিকে তিনি পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসীতে রেখে দিলেন। তখন ভগবান্ ব্যাস গান্ধারীকে বললেন–"হে সৌবলেয়ি ! আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদঘাটন করিও।" এই কথা বলে মহর্ষি তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে চলে গেলনে।১,

দুর্যোধনের জন্মকাহিনী বিশ্লেষণ করলে যে সত্য সহজেই নিরূপিত হয়

তা হচ্ছে, গান্ধারীকে মোট চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁর প্রথম সন্তান উৎপাদনের জন্য। তার মধ্যে দু'বছর গর্ভধারণ করতে হয়েছিল তাঁকে। দু'বছর পরে নিজের গর্ভপাত করালেন তিনি এবং প্রসব করলেন লৌহকঠিন একখণ্ড মাংসপিণ্ড।২ জীবের জন্মসম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র ধারণা আছে তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, দু'বছর ধরে গর্ভধারণ এক অবাস্তব ঘটনা। মহাভারতের আর কোন মহীয়সী নারীর এমন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। সাধারণতঃ আমরা জানি, দশমাস দশদিন পরে মাতৃ জঠরের গভীর অন্ধকার থেকে মহানিষ্ক্রামনের পথে মুক্তির আলো দেখতে পায় মানব শিশু। 'দশমাস দশদিন পরে, কথাটি কথার লবজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশে। বহুল প্রচারিত লোকসঙ্গীতের সেই গানের কথা এ প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণীয়ঃ 'দশমাস দশদিন পরে, জন্ম নেব মা মাসীর ঘরে ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় গর্ভধানের ন'মাস থেকে সাড়ে ন'মাসের মধ্যে আসে মানবশিশু মুক্তির সেই মহাক্ষণটি। বলা বাহুল্য যে, ইতিমধ্যে মাতৃগর্ভে পূর্ণাবয়ব পেয়ে পেয়ে থাকে শিশু।৩ অতএব দু'বছর গর্ভধারনের পর জোরপূর্বক গর্ভপাত এবং মাংসপিণ্ডের জন্মলাভে সন্দেহ আরো দৃঢ়মূল হয় আমাদের মনে। প্রশ্ন জাগে, গান্ধার জননী কি গর্ভধারণ করেছিলেন আদতে? গর্ভধারণ যে করেননি, মাংস পিণ্ডের জন্মলাভে তা প্রমাণিত। সম্ভবত নয়, নিঃসন্দেহে তাঁর পেটে ছিল টিউমার। টিউমারের বাংলা শব্দার্থে দাঁড়ায় আব বা বাড়তি মাংসপিণ্ডই। এ জাতীয় খবর আমরা অবশ্য সংবাদ পত্রের মাধ্যমে পেয়ে থাকি মাঝে মধ্যেই। আর আপনা থেকে খসে পড়ে না কখনও। কাজেই টিউমার অপসারণে আবশ্যক হয়েছিল অস্ত্রোপচারের। এতে অশেষ যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল গান্ধারীকে। কেননা সে যুগে টিউমার অপারেশন করা সহজসাধ্য ছিল না নিশ্চয়ই।

ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতেই ঘটানো হয়েছিল গান্ধারীর গর্ভপাত।৪ গর্ভপাতের কালে যে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছিল সেকথাও লেখা আছে মহাভারতে। গন্ধারীর এই লুকোছাপার কারণ কি? এ কি শুধু ঈর্ষা, ব্যর্থতা না আর কিছু? কুন্তীর পুত্র আগে জন্মলাভ করায় তাঁর পক্ষে নারীসুলভ ঈর্ষাবোধ স্বাভাবিক। কুন্তীর আগেই গর্ভধারণ করেছিলেন তিনি, অন্তত গর্ভধারণের ধারণা হয়েছিল তাঁর কিন্তু কুন্তীর পুত্র জন্মলাভের পরেও যখন তাঁর গর্ভ অচল তখন সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন গান্ধারী। ব্যাসদেবের বরে শতপুত্রের জননী হওয়া তো দূরের কথা একটিমাত্র সন্তানের জন্মলাভও সম্ভব হয়নি দীর্ঘ

দু'বছরে। প্রাকৃতিক নিয়মে এমনটি হওয়ার কথা নয়। যে কারণে তাঁকে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল একান্তই। কিন্তু এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাত না করাবার উদ্দেশ্য কি? আমরা জানি এবং কিছু আলোচনাও করেছি যে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অর্থাৎ রানী কুন্তীর প্রথম বৈধ সন্তানের জন্মসংবাদ মোটেই সুখকর ছিল না হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। "বংশে প্রথম জাত হওয়ায় সিংহাসনের ওপর যুধিষ্ঠিরের দাবিই অগ্রগণ্য। সুতরাং গান্ধারী পুত্রের জন্মের আগে কুন্তীপুত্রের জন্মসংবাদের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ধৃতরাষ্ট্র যদি কুরুরাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন আইন-মাফিক তাহলে আগেই হোক অথবা পরেই হোক গান্ধারী তনয় দুর্যোধনের সিংহাসন লাভে বাধা থাকত না। কিন্তু অন্ধতার জন্য ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি সিংহাসনের প্রাথমিক অধিকার অর্জনে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন পাণ্ডু মহাভারতে এমন প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক রাজদণ্ড থেকে গিয়েছিল শক্ত মানুষ ধৃতরাষ্ট্রেরই করায়ত্ত। তত্রাচ সিংহাসনের অধিকারী হিসেবে ব্রাহ্মণরা পাণ্ডুপুত্রের দাবিকেই অগ্রগণ্য করেছিলেন। দাবি আরও জোরদার হয়েছে যুধিষ্ঠির কুরুবংশে প্রথমজাত পুত্র হওয়ায়। একথা যেমন জানতেন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তেমনই তা বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধারী। তাই যুধিষ্ঠীর জন্মের সংবাদ হস্তিনাপুরে পৌছালে, রাগে ক্ষোভে হতাশায় গান্ধারী স্বেচ্ছায় নিজের গর্ভপাত ঘটান।"[৫] গর্ভপাতের পরিণামে কি ফল পাবেন সে সম্পর্কে একরকম নিশ্চিন্তই ছিলেন গান্ধারী। কাজেই নন্দনলাভের সুসংবাদের পরিবর্তে ধৃতরাষ্ট্রকে দুঃসংবাদ প্রকাশ করে বিব্রত করতে চাননি তিনি।

গান্ধারীর গর্ভপাতের কালে আবার উপস্থিত হয়েছিলেন ব্যাসদেব। ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় শ্বশুরকে তখন বলেছিলেন গান্ধারী—"আপনি আমাকে পূর্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শতপুত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই মাংস-পেশী হইতে শতপুত্র উৎপন্ন করুণ।"[৬] অসম্ভব জেনেই এমন কথা বলে ব্যাসদেবকে বিপন্ন করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাসদেব তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"সৌবলেয়ি! আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অবশ্যই তোমার শতপুত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে ঘৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ স্থাপন করাইয়া এই মাংপেশীর উপর জলসেচন কর।"[৭] তত্রস্থলে ব্যাসের ব্যাসকূট আমাদের

বিভ্রান্ত করে একান্তই। আমরা সরল মনে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি সহজেই। কেননা গান্ধারী প্রসূত মাংসপিণ্ড নিয়ে জবর ভেলকি দেখিয়ে দিলেন আমাদের চোখের সামনেই। জলের সাথে কী এক সলভেন্ট মিশিয়ে দিলেন যাতে শতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল সেই লৌহ কঠিন মাংসপিণ্ড! এরপর যে বিধান দিলেন তিনি তাতে আর অবিশ্বাসের কারণ থাকে না তেমন। অতএব গুপ্তকক্ষে শতসংখ্যক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ স্থাপনের নির্দেশকে আমরা আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে মনে করি। একবারও লক্ষ্য করি না তাঁর বাক্ চাতুর্যের প্রতি। প্রসূত মাংসপিণ্ড থেকে জাত অঙ্গুষ্ঠপর্ব প্রমাণ একশ ভ্রূণকে সংগোপনে রাখতে বললেন একশ'টি ঘৃতপূর্ণ কলসে। আমরা অনুমান করতে পারি, বিশেষ ঘৃতজাতীয় ঔষধসহ বিচ্ছিন্ন মাংস খণ্ডগুলি রাখা হয়েছিল তাতে। এ যেন আধুনিককালের এম্ব্রায়ো ট্রান্সফার (Embryo-transfer) অর্থাৎ ভ্রূণ সংস্থাপন এই ভ্রূণ-সংস্থাপনে অবশ্য মাতৃ-জঠরের প্রয়োজন। ঋষিমশাইরা যে কলসিকে নারী গর্ভের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে-কথা আলোচনা করা হয়েছে আগেই। যাই হোক, ভ্রূণ সংস্থাপনের অলৌকিক কাহিনী আমরা আরও দেখতে পাই পুরাকালের কোনও কোনও অবতারের জন্মবৃত্তান্তে। যেমন জৈনধর্মের শক্তিমান সংস্কারক ও প্রচারক মহাবীরের জীবন চরিতে রয়েছে যে, "তিনি প্রথমে এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে আগমন করেন কিন্তু ক্ষত্রিয়কুলে তাঁহার জন্ম কাম্যতর মনে করিয়া দেবতারা সেই ভ্রূণ ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করেন।"[৮] আমাদের নিশ্চিত ধারণা যে, সেযুগে এ রকম ভ্রূণ স্থানান্তর করণের কাজ সহজসাধ্য ছিল না আদৌ। ছিল না এ কালের মতো অত্যুন্নত শল্যবিদ্যা বা সার্জারি। তথাপি হাল-আমলের কোনও কোনও লেখক ভ্রূণ সৃষ্টি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"এসব ব্যাপার কয়েকদিন আগেও অসম্ভব মনে হতো। সম্ভবত এখন আর তা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারব না আমরা। কেননা অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নল-জাতক-এর সৃষ্টি সম্ভবপর করে তুলেছেন।"[৯]

কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুর বাইরে ভ্রূণ সৃষ্টি এবং জরায়ুতে পুণরায় সেই ভ্রূণ সংস্থাপন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। কাজেই এ-সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই আর। আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে, যতদিন পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে প্লাসেন্টা বা ফুল তৈরী করা না যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে নলজাতকের জন্ম অসম্ভব। তবে মহাবীরের জন্ম সম্পর্কিত

অলৌকিকতত্ত্ব প্রচার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, এর পেছনে সামাজিক কারণ পুরোপুরি বিদ্যমান। তথাকথিত ধর্মপ্রাণ ভক্তগণ সাধারণ লোকদের বুঝাতে চেয়েছেন যে ক্ষত্রিয়কুলে মহাবীর জন্মেছিলেন বটে কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।" বুদ্ধ মহাবীরের যুগে ক্ষত্রিয়গণ নিজেকে ব্রহ্মণ-তুলনায় হীন মনে করিতেন না, উপনিষদেও দেখি ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ের কাছে শিষ্যত্ব স্বীকারে কোনো কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মহাবীর ভ্রূণের গর্ভ-পরিবর্তন কাহিনী অবশ্যই এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল যখন সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিতবর ভিণ্টারনিট্সের (winten-nitz) মতে জৈনগণ মহাবীরের গর্ভ-পরিবর্তন কাহিনী পৌরাণিক কৃষ্ণজন্ম-কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"১০

ব্যাস বাক্য মিথ্যা নহে। কাজেই আমরা যদি "গুপ্ত প্রদেশ" অর্থে গোপন অবস্থান এবং "ঘৃতপূর্ণ শতকুম্ভ" অর্থে যৌবনবতী শতনারী ধরে নিই তাহলে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায় অর্থাৎ গোপনে শত নারীর গর্ভে সন্তানোৎপাদনের পরামর্শ দিয়েছিলেন ব্যাসদেব। এছাড়া আর গত্যান্তর ছিল না তাঁর। কেননা, একজন নারী যতই দীর্ঘজীবী হোন না কেন, তার গর্ভে শতপুত্র উৎপাদন অসম্ভব। প্রকৃতিক নিয়মানুযায়ী একজন নারীর গর্ভধারনের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ পঁয়তাল্লিশের পর বন্ধ হয়ে যায় ঋতুস্রাব। নারীর ঋতুমতী হবার বয়স যদি বারো তেরো বছর থেকেই ধরা যায় আর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশে তার সমাপ্তি ঘটে তা'হলে বত্রিশ-তেত্রিশ বারের বেশি গর্ভধারনের সংযোগ ঘটে না অর্থাৎ প্রতি বৎসর সন্তান-সম্ভবা হলে একজন নারীর গর্ভে বত্রিশ-তেত্রিশটি সন্তান জন্ম দিতে পারে কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। বিশ-বাইশটির বেশি সন্তানের জন্মদাত্রীর সাক্ষাৎ মেলে কদাচিৎ। তবে প্রতিবারে যমজ সন্তানের জন্ম হলে আলাদা কথা।১১

দ্বিতীয়তঃ, এক অথবা দু'বছরের মধ্যে শত সন্তানের জন্ম দিতে হলে শত সংখ্যক নারীর গর্ভধারণ প্রয়োজন।১২ অস্ত্রোপচারের পর স্বল্প সময়ের অবকাশে গান্ধারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা ছিল বলে মনে হয় না। আর থাকলেও ঐ সময়ের মধ্যে একটির বেশি সন্তানের জন্মদান সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। আমরা জানি সেই সন্তানই দুর্যোধন। বাকী পুত্র সন্তানেরা গন্ধারীর পুত্র বলে পরিচিত। বস্তুতপক্ষে বাকীরা তাঁর গর্ভজাত সন্তান নয়। দুঃশলা-নামী এক শতাধিকা-কন্যারও পরিচয় পাই এখানে। বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু ছাড়া

ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত বাকী সন্তানেরা সকলেই গান্ধারীর সন্তান। শতাধিক সন্তানের জননী হিসাবে তার পক্ষে এ ছিল অধিক গৌরবের। ভারতীয় নারীরা তো মা হতেই ভালবাসেন। তাছাড়া শুধু জন্ম দিলেই তো মা হয়না, যিনি লালন-পালন করেন তিনিও মা। আমরা রামপ্রসাদী সঙ্গীতে তাই শুনতে পাই—'মা হওয়া কি মুখের কথা, জন্ম দিলেই হয় না মাতা।' সাগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ছিল, তার অর্থ এ নয় নিশ্চয় যে, এই ষাট হাজার সন্তানই ছিল তাঁর ঔরসজাত। এরা ছিল রাজা সগরের খাস তালুকের প্রজা অথবা রাজ্যের শ্রমিক সকল। প্রজারাতো সন্তান তুল্যই। তবে একশ সন্তানের পিতা হওয়া এমন বড় কথা কিছু নয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলে গো-ধর্মা পুরুষের পক্ষে একশ' দিনেরও প্রয়োজন হয় না বস্তুত। কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের মত অতিশয় বলবীর্যশালী পুরুষের পক্ষে শত সংখ্যক নারীর গর্ভসঞ্চারে তিন থেকে চার মাস সময় লেগেছিল মাত্র। অতএব দু'বছর সময় সীমার মধ্যে কিছু আগে পরে জন্ম নিয়েছিল শতাধিক পুত্রকন্যা। যদি মাংসপিণ্ড থেকে জন্ম হত সকলের তাহলে সহজেই ঘুরে যেত সময়ের ব্যবধান। কার্যত তা হয়নি। বলা হয়েছে দুর্যোধনই তাঁর প্রথম সন্তান।

দুর্যোধনই যে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠপুত্র এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট। দুর্যোধন গান্ধারীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র হলেও ধৃতরাষ্ট্রের নয় বলেই অনুমান। কেননা গান্ধারী একবারই মাত্র গর্ভধারণ করেছিলেন বলে, বলা হয়েছে মহাভারতে।১৩ তিনি যখন গর্ভভারাক্রান্ত হয়ে নিতান্তই কাহিল ছিলেন তখন এক বৈশ্যা পরিচারিকার সঙ্গে মিলিত হতেন ধৃতরাষ্ট্র। তার ফলে সেই বৈশ্যা যুবতীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে সেই বৎসরই 'যুযুৎসু' নামে করণ জাতীয় এক বুদ্ধিমান পুত্রের জন্ম হয়েছিল।১৪ গান্ধারী তো মাংসপিণ্ডের জন্ম দিয়েছিলেন প্রথম এবং তার এক বা দু'বছর বাদে জন্ম হয়েছিল দুর্যোধনের। যুযুৎসু'র জন্ম কোনও কারণে ঠেকে ছিল বলে জানা নেই আমাদের। ধরে নিতে হবে স্বাভাবিক নিয়মেই দশমাসের মধ্যে জন্ম হয়েছিল তার। তাহলে হিসাবমত যুযুৎসুই ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কিন্তু কোথাও দেখানো হয়নি তা। অবশ্য আর এক হতে পারে যে, অস্ত্রোপচারে মাংসপিণ্ড অপসারণের পর দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের কালে গান্ধারী যখন গর্ভভারে ক্লেশমানা হয়ে পড়েছিলেন তখনই সেই বৈশ্যা যুবতীর গর্ভোৎপাদন করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। এটাই বরং স্বাভাবিক এবং জন্মগত কাহিনীর মিল থাকে সর্বদিক থেকেই। তাহলে

আবার শত পুত্র জন্মের কাহিনী-রস ফিকে হয়ে আসে অচিরে এবং প্রমাণিত হয় তাহা মিথ্যা। মহাভারতে এরকম অনেক গোঁজামিলের কাহিনী আছে যার হাল-হদিস আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্ক পরিহার করতে গিয়ে পূর্বজন্মের কাহিনী টেনে এনে নিষ্কৃতি পেয়েছেন ঋষিমশাইরা। সর্বত্র জাহির করা হয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। শাপের ক্ষেত্রে যেমন, বরের ক্ষেত্রেও তেমনি। লৌকিক উপায়ে যেসব বিষয়ের সমাধান অসম্ভব। বিশেষ করে বরদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিপদ ডেকে এনেছেন তা-বড় দেবতা বা বাঘা বাঘা মুনি ঋষিরা। এর কারণ হচ্ছে ক্ষমতাবানদের অবিবেচনা, হঠকারিতা আর নীতিহীনতা।১৫

অন্যসব ক্ষমতার মতো বরদানের ক্ষমতা যে সবদেবতার সম পরিমাণে ছিল না, একথা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতো উচ্চবর্গের দেবতাদের এবং মহাশক্তিরূপিনী দেবীদের যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা নিশ্চয়ই অন্যান্য কম-ওজনের দেব-দেবীদের ছিল না। মুনি-ঋষিদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট মুনি-ঋষিদের বরদানের যে ক্ষমতা ছিল, কম-দামের মুনি-ঋষিদের তা থাকার নয়। ছোট-খাটো মাপের মুনিঋষিরা যে-হারে শাপ প্রদান করেছেন, সেই হারে বরদান করেছেন কদাচিৎ। যাই হোক, বরদানের ব্যাপারে উচ্চবর্গের দেবতারাই হোন কিংবা বিশিষ্ট মুনি-ঋষিরাই হোন—সকলেই ছিলেন মুক্ত হস্ত এবং মুক্তকচ্ছ। কথায় কথায় 'তথাস্তু' বলে দিলদরিয়া হয়ে বরদান করায় সময় সময় গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি, যে-গল্প প্রায় সকলেরই জানা। একবার দেবাদিদেব মহাদেব না ভেবে-চিন্তেই বর দিয়ে বসলেন ভস্মলোচনকে। চোখের আগুনে দগ্ধ করার অগাধ ক্ষমতা পেয়েছিল সে। কিন্তু বর খাঁটি কি-না তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য বরদাতার উপরই প্রয়োগ করতে উদ্যত হল প্রথম। তখন শুধু মুক্তকচ্ছ হয়ে নয় : একেবারে দিগম্বর হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটতে লাগলেন শিবঠাকুর। পিছনে পেছনে সেই কালান্তর যম। অবশেষে ব্রহ্মার পরামর্শে ভস্মালোচনের সামনে তুলে ধরা হল এক দর্পণ। সেই দর্পণে নিজের মুখ দেখে নিজেই ভস্ম হল সে। বিপন্মুক্ত হলেন দেবাদিদেব।

ব্যাসদেবের বর এক্ষেত্রে আশু বিপজ্জনক না হলেও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় নিঃসন্দেহে। গান্ধারী বর চাইলেন যে, "যেন আমার গর্ভে আমার

ভর্ত্তার সমানগুণশালী শত পুত্র জন্মে।"১৬ ব্যাস অমনি 'তথাস্তু' বলে প্রস্থান করলেন। অথচ একবারও ভেবে দেখলেন না তিনি যে এই বরে ফললাভ একান্তই অসম্ভব, পার্থিব নিয়ম বিরোধী। এতেও ক্ষান্ত হলেন না ঋষিবর। দু'বছর পরে গান্ধারী যখন মাংসপিণ্ড প্রসব করলেন, তখন সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন ব্যাসদেব। গান্ধারী তাঁকে জব্দ করবার জন্যই যেন বললেন, "আপনি আমাকে পূর্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই মাংসপেশী হইতে শত পুত্র উৎপন্ন করুন।" একবার যখন মুখ ফসকে বর দিয়েই ফেলেছেন তখন ত আর ফিরাবার জো নেই। ইমেজ বড় বালাই। কথায় বলে, হাতীকা দাঁত—মরদকা বাত। কাজেই অহং ভরে ব্যাস বললেন—"সৌবলেয়ি। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অবশ্যই তোমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে।"

ব্যাসদেব শুধু গল্প কথারই যাদুকর ছিলেন তাই নয়, লোকজীবনেও না-কে হাঁ করবার ভোজবিদ্যায় এবং হিপ্‌নোটিজমে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। আমরা দেখতে পেলাম, মৃত মাংসপিণ্ড নিয়ে কী খেলাটাই না খেললেন তিনি! ঘৃত-পূর্ণ শতাধিক কুম্ভের ভোজবাজিতে তাক লাগিয়ে দিলেন আমাদের। কিন্তু আমরা জানি, নারী গর্ভের একটিপূর্ণ ফ্যালোপিয়ান টিউবেই হোক কিংবা জরায়ুতেই হোক সন্তান নষ্ট হয়ে গেলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও তা গর্ভপাতের ফলে বেরিয়ে আসে সাধারণত। গান্ধারীর ক্ষেত্রে তা হয়নি আদপে। টিউমার ছাড়া দু'বছর গর্ভধারণ করে থাকা এক অবাস্তব ঘটনা। টিউমার বা মাংসপিণ্ড থেকে কি ভাবে তিনি ভ্রূণ উৎপাদন করলেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যারা কুম্ভ জাতককে আধুনিক কালের নলজাতক বলে চালাতে চাইছেন তাঁদের অন্তত জানা উচিত মাতৃগর্ভের বাইরে শুক্রাণু দিয়ে ডিম্বাণু নিষিক্ত করে সন্তানের জন্মদান এক কঠিন সাধ্য কাজ। এতে কত নারীর বিদ্যাবিদ এবং ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ কতবার অকৃতকার্য হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। মাতৃগর্ভের বাইরে প্রথমত, কাচের পাত্রে অর্থাৎ টেস্টটিউব বা পিট্রিডিশে সঙ্গে তথায় একসাথে হর্ণাকিউবেট করে (বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে in vitro সৃষ্টি করা হয় ভ্রূণ। তারপর সেই ভ্রূণ খুবই সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পিপেটের সাহায্যে তুলে নিয়ে অতি সাবধানে যোনিপথে জরায়ুতে যথাযথভাবে স্থাপন করা গেলে তবেই সন্তানের জন্ম সম্ভব। কাজেই মৃত ভ্রূণ বা মাংসপিণ্ড থেকে সন্তান জন্ম সম্ভব নয় কখনই। সে যুগে জীবের জন্ম সম্পর্কে

সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বিশেষ। বিজ্ঞানের ফল ভোগ করা এক জিনিস, আর তার হাল-হকিবৎ জানা আলাদা জিনিস। সাধারণের বিশ্বাস সন্তানের জন্ম ভগবানের হাতে। তার প্রেরিত দূত মর্ত্যের মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত, পীর-পয়গম্বর, অবতার-ভক্তদের রিকমেণ্ডেশান ফেলে দিতে পারেন না তিনি। স্বীকৃতি স্বরূপ সন্তানের নাম রাখা হয় এদেরই নামানুসারে। কখনও কখনও খোদ ভগবান্ বা ঈশ্বরের নামে।

আগেই বলা হয়েছে বরদানের ক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার ছাড়া লৌকিক উপায়ে তা পাওয়া সম্ভব হত না প্রায়শই। ব্যাসদেবও অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার করেছেন গান্ধারীর শতপুত্র লাভের বিষয়ে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অলৌকিকতত্ত্ব ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মাত্র, যা আপাত দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যুক্তিবাদী মন ব্যাসের ভেল্কিকে সত্য বলে মেনে নিতে পারেনা কখনই। বিজ্ঞান এক পরীক্ষিত সত্য। এই সত্যের আলোকে সব কিছুই যাচাই করে নিতে হবে আমাদের। শাস্ত্র নির্দেশ বা ঋষি বাক্য বলে বিশ্বাস করতে হবে—এমন কোনও কথা নেই। বৈদিক ঋষি বৃহস্পতি বলেছেন—"কেবল শাস্ত্র নির্দেশ বলে কোন কাজ করা ঠিক নয়। যুক্তি ও বিচার দ্বারা গ্রহণযোগ্য না হলে উহা বর্জনীয়।" ব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ট দেবই বলেছেন---"ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত হলেও যুক্তিহীন কর্ম পরিত্যাজ্য।" শাস্ত্রে আছে---যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে।" অর্থাৎ যিনি যুক্তি মানেন না, তিনি ধর্মও মানেন না। বস্তুত বিশ্বাস ও যথার্থ জ্ঞান এক কথা নয়। কাজেই বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের ধর্মকে মেনে নিতে পারি কিন্তু ব্যাস বলেছেন বলেই অন্ধবিশ্বাসে তা মেনে নিতে পারি না। সত্যি বলতে কি গান্ধারীকে শত পুত্রের জননী হবার বর দিয়ে সত্যের অপমানই করেছেন তিনি।

সম্ভবত এক দুর্যোগপূর্ণ রাতের প্রহর শেষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দুর্যোধন। মহাভারতকারের মতে তা আংশিক স্বীকৃত হয়েছে মাত্র। দুর্যোধনের জন্মপত্রিকা অনুযায়ী অর্থাৎ কোষ্ঠী বিচারে বর্তমান ১৯০৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে পাঁচ হাজার একশ' ছাপান্ন বছর আগে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এক কাকভোরে পূর্ব-ফাল্গুনী নক্ষত্রযোগে জন্মেছিলেন তিনি।১৭ একই দিনে জন্মেছিলেন মহাবাহু ভীমসেন। দুজনেই ছিলেন

সমবয়স্ক ও সমযোদ্ধা। গদাযুদ্ধে তাদের সমকক্ষ ছিলনা কেউ তৎকালে। কথিত আছে, জন্মক্ষণে গর্দ্দভের মত কর্কশকণ্ঠে রোদন করে উঠেছিলেন দুর্যোধন এবং সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে আরও অনেক গর্দ্দভ, গৃধ, কাক ও শেয়াল ডেকে উঠেছিল সেই সময়। সেই সময়েই বয়ে গিয়েছিল ঝড়েরবেগে প্রবল বায়ুপ্রবাহ। শুরু হয়েছিল দিগ্‌দাহ।১৮ সেই সময় ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম-বিদুর প্রমুখ সভাসদজন এবং কুরুবংশীয় অন্যান্য প্রধানরা বিধান দিয়েছিলেন এই বলে যে, নবজাতককে পরিত্যাগ করা উচিত কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে ততোধিক অন্ধ হয়ে পরিত্যাগ করতে পারেন নি সেই শিশুকে। দুর্যোধনের জন্মলগ্নে অশেষবিধ অশুভ প্রাকৃতিক লক্ষণ অনুযায়ী সমাজপতিরা তাকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পাপাত্মা', 'দুরাত্মা' ইত্যাদি অভিধায়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মার কোনও অস্তিত্ব নেই। জন্মকালে পৃথিবীর সব শিশুই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। জন্মের পরে কোনও শিশু সন্ত হবে, না শয়তান হবে তা মূলতঃ নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের উপর। জীবদেহ পুরোপুরি পরিবেশেরই অধীন। একদা বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য 'জড় উপাদান হতে উদ্ভুত হয়ে মানুষ আবার জড় উপাদানেই ফিরে যায়। মৃত্যুর পরে পরে মানুষের কোন চেতনা থাকে না।' বস্তুত প্রাণ বাস্তব ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলমাত্র। জড় হতেই প্রাণের সৃষ্টি।১৯ এই পৃথিবীর প্রাণীকুল স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিশেষ। প্রাণান্তে জীবলীলারও অন্ত। মরনের পরে আদিভূতে লীন হয়ে যায় জীবদেহ।

যে কোনও কারণেই হোক, সদ্যজাত অসহায় শিশুকে পরিত্যাগ করে মানবধর্ম বিরোধী কোনও হীনকর্ম অন্তত সম্পাদন করেননি ধৃতরাষ্ট্র। তথাপি তিনি নিন্দার্হ হয়েছেন ব্রাহ্মণ্য প্রধান সমাজের কাছে। অন্তহীনকাল যাবৎ দায়ী হয়ে আছেন অসংখ্য লোক ও কুলক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটনের অপরাধে। তা হলেও আমরা বলতে পারি মানবিক দৃষ্টিতে ধৃতরাষ্ট্র একজন গণতান্ত্রিক মানুষ। কেননা তাঁর প্রথম সন্তান জন্মের পরে পরেই ব্রাহ্মণগণ রাজসভাসদজন এবং সভাস্থ পাত্র-মিত্র সকলকে একত্রিত করে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি— "মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান, অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা যে আমার এই জ্যৈষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাগী হইবে কিনা? আপনারা কি বিবেচনা করেন, বলুন।" কিন্তু কি জবাব পেলেন তিনি? তাঁর

কথা শেষ হতে না হতে শ্মশানের শবাদির মাংসভোজী প্রাণিগণ এবং অমঙ্গল সূচনাকারী শিবাকুল ডেকে উঠল সহসা। ব্রাহ্মণগণ এবং ধীমান্ বিদুর সেইসব দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করে বলে উঠলেন অমনি—"রাজন! আপনার জেষ্ঠপুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই দুরাত্মা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; রাখিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে।" এইখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে —প্রাকৃতিক নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অতিপ্রাকৃত ভোজবাজিতে দুর্যোধনাদি শতপুত্রের জন্ম সম্ভব করেছেন ব্যাসদেব, সেই প্রাকৃতিক নিয়মকেই আবার হাতিয়ার করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করেছেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূরা। ধীমান বিদুর এবং ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মনে করেছেন অশুভ সংকেত কিন্তু এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। চৈতিরাতে শুধু মলয় পবনই প্রবাহিত হয়ে চলবে এমন কোনও কথা নেই, কাল বৈশাখী ঝড়েরও ইঙ্গিত দিয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। অতি ভোরে কাক-.শয়ালের রা কাড়াই স্বাভাবিক। এসব নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহকে অস্বাভাবিক চোখে দেখাই অবশ্য আমাদের ধর্মের চাঁইদের মাহাত্ম্য। ক্ষেত্র বিশেষে আবার চোখ বন্ধ করে মৌন থাকেন তাঁরা। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? দুর্যোগের রাতে জন্মের কারণে যদি দুরাত্মা বা পাপাত্ম হন দুর্যোধন তাহলে শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা হন কোন্ সুবাদে? তাঁরও জন্মের রাতে প্রায় প্রলয় কাণ্ডই ঘটে গিয়েছিল ঝড়-জল বজ্রপাতে। তাতে দোষের কিছু হয়নি বরং সূচিত হয়েছে দেবতাত্মার আগমন বার্তা। আবার জন্মমাত্রই দুর্যোধন গর্দ্দভ রাগিনীতে গান গেয়ে উঠেছিলেন বলে শাস্ত্র-মতে তা হয়েছে ভয়াবহ দোষের অথচ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যে হ্রেষারবে পাড়া মাত করেছিলেন তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি কিছু। আসলে আমাদের সনাতন ধর্মের লোকেরা যুক্তিবাদের ধার ধারে না কখনই। শুধু ঋষি বাক্য সংস্কার ও লোকাচারের মধ্যে রয়ে গেছে আবদ্ধ। সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারারও প্রসার নেই, যাতে তারা সম্ভব-অসম্ভব সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতে পারে সহজে। কাজেই পৌরাণিক কাহিনীর অনেক অবাস্তব কথাই লোকে অলৌকিক বলে নিয়েছে নির্ব্বিবাদে।

মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর হস্তিনার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল সাময়িক। তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির তখন নিতান্ত শিশু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ, বিদুর ছিলেন পারশব। রাজসিংহাসনে

এঁদের অধিকার ছিল না কারো। পক্ষান্তরে পাণ্ডুর জীবিতাবস্থাতেই রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনিই ছিলেন রাজা। যে কারণেই হোক, সদ্যোজাত অসহায় শিশুকে পরিত্যাগ করে মানব ধর্ম বিরোধী কোনও, হীনকর্ম অন্তত সম্পাদন করেননি ধৃতরাষ্ট্র। তথাপি তিনি নিন্দার্হ হয়েছেন ব্রাহ্মণ্যপ্রধান সমাজের কাছে। অন্তহীন কাল যাবৎ যেন দাগী হয়ে আছেন অসংখ্য লোক ও কুলক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ সংগঠনের অপরাধে। মানবিক দৃষ্টিতে তাহলেও আমরা বলতে পারি, ধৃতরাষ্ট্র একজন গণতান্ত্রিক মানুষ। কেননা, তাঁর প্রথম সন্তান জন্মের পরেই ব্রাহ্মণগণ, রাজসভাসদজন এবং পাত্র-মিত্র সকলকেই একত্রিত ক'রে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি—"মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান, অতএব এ-রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র, যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাগী হইবে কিনা? আপনারা কি বিবেচনা করেন, বলুন।" কিন্তু কি জবাব পেলেন তিনি? তাঁর কথা শেষ হতে না-হতেই শ্মশানের শবাদির মাংসভোজী প্রাণিগণ এবং অমঙ্গলসূচক শিবাকুল ডেকে উঠল সহসা। ব্রাহ্মণগণ এবং ধীমান বিদুর সেইসব দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করে বলে উঠলেন অমনি—"রাজন্। আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই দুরাত্মা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য, রাখিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই, যে প্রাকৃতিক নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অতিপ্রাকৃত ভোজবাজিতে দুর্যোধনাদি শতপুত্রের জন্মসম্ভব করেছেন ব্যাসদেব, সেই প্রাকৃতিক নিয়মকেই আবার হাতিয়ার করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করেছেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূরা। ধীমান্ বিদুর এবং ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ধরে নিয়েছেন অশুভ সংকেত কিন্তু এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। চৈত্ররাতে শুধু মলয় পবনই প্রবাহিত হবে এমন কোনও কথা নেই, কালবৈশাখী ঝড়েরও ইঙ্গিত থাকে মাঝে-মধ্যে। অতিভোরে কাক শেয়ালের রা' কাড়াই স্বাভাবিক। এসব নৈসর্গিক ব্যাপারকে অস্বাভাবিক চোখে দেখাই অবশ্য আমাদের ধর্মের চাঁইদের মাহাত্ম্য। ক্ষেত্র বিশেষে আবার চোখ বন্ধ করে মৌন থাকেন তাঁরা। কিন্তু 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' দুর্যোগের রাতে জন্মের কারণে যদি দুরাত্মা বা পাপাত্মা হন দুর্যোধন তাহলে শ্রীকৃষ্ণইবা মহাত্মা হন কোন সুবাদে? তাঁরও জন্মের রাতে প্রায় প্রলয় কাণ্ডই

৬

ঘটে গিয়েছিল ঝড়-জল-বজ্রপাতে। তাতে দোষের কিছু হয়নি বরং সূচিত হয়েছে দেবতাত্মার আগমন বার্তা। আবার জন্মমাত্রে দুর্যোধন গর্দভ রাগিনীতে গান গেয়ে উঠেছিলেন বলে শাস্ত্রমতে তা হয়েছে ভয়াবহ দোষের অথচ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যে হ্রেষারবে পাড়ামাত করেছিলেন তাতে কিন্তু মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি কিছু। আসলে আমাদের সনাতন ধর্মের লোকেরা যুক্তিবাদের ধার ধারেন না বড় একটা। শুধু ঋষিবাক্য, সংস্কার ও লোকাচারের মধ্যে আবদ্ধ। সবকিছু নিপাতনে সিদ্ধ হলেই তারা খুশী। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে অদ্যাবধি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারারও প্রসার নেই তেমন যাতে সম্ভব-অসম্ভব, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ যাচাই করে নিতে পারে তারা সহজেই। এ-কারণে পৌরানিক কাহিনীর অনেক অবাস্তব কথাই লোকে অলৌকিক বলে মেনে নিয়েছে নির্বিবাদে।

মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর হস্তিনার রাজ সিংহাসনের নিঃসপত্ন উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল একান্তই। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ, বিদুর ছিলেন পারসব। শাস্ত্রানুযায়ী রাজসিংহাসনে এঁদের অধিকার ছিল না কারো। তথাপি পাণ্ডুর জীবিতাবস্থায়ই রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর ছিলেন মন্ত্রী। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত প্রথম সন্তান দুর্যোধন। পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরের পর দুর্যোধন রাজা হোক এই ছিলো তাঁর মনোগত ইচ্ছা। কিন্তু এমত ইচ্ছার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন বিদুর। কেননা, পাণ্ডুপুত্র নামে পরিচিত হলেও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিলেন তাঁরই ঔরসজাত কুরুবংশের প্রথম সন্তান। যদিও তা ছিল নিতান্তই অপ্রকাশ্য। এমন এক সংকটজনক অবস্থায় আমরা তাই দেখতে পাই, দুই রাজপুত্রের বংশানুক্রমিক সিংহাসন প্রাপ্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই অনধিকারী পিতার কৌশলগত সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেছে কুরুক্ষেত্রের মহারণে, অসংখ্য মরণে। আমরা আরও দেখতে পাই দুই পুত্রই রাজা হয়েছে ভবিষ্যতে কিন্তু কারও বংশধরই রাজা হয়নি শেষ পর্যন্ত। অথচ হস্তিনার সিংহাসনে যে কোনদিন রাজা হয়নি, সম্ভাবনাও ছিলনা কখনও, সেই মহাযোদ্ধা অর্জুনেরই বংশধারা লাভ করেছে রাজসিংহাসন। কুরুবংশের অধস্তন বংশধর অশ্বমেধদত্তের পরে আর কারও নামের উল্লেখ নেই মহাভারতে।২০

জন্মমুহূর্তে যে-দুর্যোধনকে দুরাত্মা-পাপাত্মা-ক্রুর-দুর্মতি আখ্যায় ভূষিত করেছেন ধার্মিক প্রবররা সেই দুর্যোধনকেই আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাই

অশেষ গুণাবলীসম্পন্ন রাজেন্দ্র দুর্যোধনরূপে। রাজধর্ম অনুসারে হীনজাত কর্ণের বীরত্বকে অভিনন্দিত করেছেন তিনি। যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে রাজ্য ও রাজপদ দান করেছেন তাঁকে। গুরুজনদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সামাজিক নিয়মে। প্রতিপালন করেছেন আশ্রিতজনদের। ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করেছেন অকুতোভয়ে। যে-কারণে এই উদার মানবতাবাদী দুর্যোধনের সমর্থক ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা নগণ্য ছিলনা নিতান্তই। জ্যেষ্ঠজনেরা যথেচ্ছ নিন্দা-মন্দ-তিরস্কার করলেও নতমস্তকে তা মেনে নিয়েছেন তিনি। ঘৃণাভরে কেউই পরিত্যাগ করে যাননি তাঁকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যত রাজা ও রাজ্য যোগদান করেছিল তাঁর পক্ষে, তত রাজা বা রাজ্য যোগদান করেনি পাণ্ডব-শিবিরে। "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধন শিবিরে সমবেত হয়েছিল কাশ্মীরের একটি ক্ষুদ্রাঞ্চল, 'অভিসার' রাজ্য ব্যতীত সমগ্র উঃ পঃ (উত্তর-পশ্চিম) ভারত এবং সমগ্র পূর্ব ভারত। মধ্যদেশ থেকে একটিমাত্র রাজ্য কুরুশিবিরে যোগ দেয়। এ-ছাড়া যুদ্ধার্থী হিসেবে সমবেত হয়েছিলেন, দ্বিধা বিভক্ত যদুদের বিরাট এক বাহিনী (নারায়ণী সেনা), বৃষ্ণি, অন্ধক, মালব, নিষধ, শাল্ব, কিরাত, ভোজ, হার্দিক্য ও ভূরিশ্রবার নেতৃত্বাধীন বীরবৃন্দ।"২১ পাণ্ডব শিবিরে যোগদান করেছিল মৎস্য পাঞ্চাল-কাশী-করুষ-চেদী-মগধ (পশ্চিম) প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র রাজ্য।

সবশেষে, তাঁর মৃত্যুর পর স্বর্গবাসেও আমরা দেখতে পাই, সূর্যের ন্যায় প্রভান্বিত হয়ে দেবগণের ও সাধ্যগণের মধ্যে বসে আছেন রাজেন্দ্র দুর্যোধন। যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন উচ্চৈস্বরে, 'আমি দুযোধনের সঙ্গে বাস করব না।' ··তখন "নারদ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, এমন কথা ব'লো না, স্বর্গে বাস কালে বিরোধ থাকেনা; স্বর্গবাসী সকলেই দুর্যোধনকে সম্মান করেন। ইনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হলেও ইনি কখনও ভীত হননি। তোমরা পূর্বে যে কষ্ট পেয়েছিলে তা এখন ভুলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ করে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হও"।২২ কিন্তু এই উপদেশ সর্বান্তকরণে শিরোধার্য করতে পারেননি যুধিষ্ঠির।

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১। গল্পের উদ্ধৃতাংশ কালী প্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত থেকে সংগৃহীত। বাকী তর্জমা রাজশেখর বসুর মহাভারত অনুসরণে লেখকের নিজস্ব।

২। ততো জজ্ঞে মাংসপেশী লোহাষ্ঠীলেব সংহতা।
দ্বিবর্ষসংভৃতাং কুক্ষৌ তামুৎস্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥ ১২ ॥ আদিপর্ব
অন্বার্থ—তাতে লৌহ কঠিন একখণ্ড মাংসপিণ্ড জন্মিল। দুই বছর পর্যন্ত যা উদরে ধারণ করেছিলেন তা একটা মাংসপিণ্ড দেখে গান্ধারী সেটাকে ফেলে দেবার উদ্যোগ করলেন। —হরিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত মহাভারতম-এর ১০৯ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩। "মোটামুটি গর্ভ সূচনার অষ্টম সপ্তাহ থেকে গর্ভস্থ ভ্রূণ খানিকটা মানবিক আকৃতি, পায়। অন্তত মানুষের ভ্রূণ বলে চেনা যায়। এ সময়ে ভ্রূণদেহে প্রাথমিক চক্ষু, কর্ণ এবং কুঁড়ির আকারে হাত ও পায়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। আট-নয় সপ্তাহের মধ্যেই ভ্রূণের লেজটি খসে পড়ে। বলা বাহুল্য, এই লেজ বিবর্তনের পথে মনুষ্যেতর বানর জাতীয় পূর্ব পুরুষেরই অমোঘ স্বাক্ষর।
দ্বাদশ সপ্তাহের মধ্যেই প্লাসেণ্টা পুরোপুরি গঠিত হয়। হাত-পায়ের আঙুলগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় থেকেই ভ্রূণটিকে 'ফিটাস' বা 'পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ বলা হয়।
গর্ভ সূচনার প্রায় ২৪ সপ্তাহ পর ভ্রূণের মাথার উপর চুল গজায়, আঙুলে দেখা দেয় নখ।…ন মাস থেকে সাড়ে ন মাসের মধ্যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।…
—নলজাতকের উপাখ্যান রমেন মজুমদার ['ভ্রূণের ক্রমিক বৃদ্ধি' দ্রষ্টব্য]

৪। অজ্ঞাতং ধৃতরাষ্ট্রস্য যত্নেন মহতা ততঃ।
সোদরং পাতয়া মাস গান্ধারী দুঃখমূর্চ্ছিতা ॥ ১১ ॥ ১০৯ অধ্যায়। আদিপর্ব
অর্থাৎ তাহার পর গান্ধারী মনোদুঃখে কর্তব্য জ্ঞান শূন্য হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে সেই গর্ভ পাত করিয়া ফেলিলেন।

৫। কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির—বীরেন্দ্র মিত্র। 'বিদুরের ধর্ম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
পৃষ্ঠা সংখ্যা—৫৭।

৬। শতঞ্চ কিল পুত্রাণাং বরো দত্তস্ত্বয়া পুরা।
ইয়ঞ্চ মে মাংস পেশী জাতা পুত্রশতায় বৈ ॥ ১৬ ॥—আদিপর্ব অধ্যায় ১০৯।
অন্বার্থ—আপনি পূর্ব্বে আমাকে একশত পুত্র হইবে বলিয়া বর দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার সেই একশত পুত্রের স্থানে এই একটা মাংসপিণ্ড জন্মিয়াছে।
—অনুবাদ, সিদ্ধান্তবাগীশ।

৭। ঘৃতপূর্ণং কুম্ভশতং ক্ষিপ্রমেব বিধীয়তাম্।
সুগুপ্তেষু দেশেষু রক্ষা চৈব বিধীয়তাম ॥ ১৮ ॥ আদিপর্ব ১০৯ অধ্যায়
অর্থাৎ সত্বর একশত কলসীতে ঘৃত পূর্ণ কর তাহার পর, সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষিত স্থানে রাখিয়া দাও। —অনুবাদ, সিদ্ধান্তবাগীশ

৮। জৈন ধর্ম—অমূল্য চন্দ্র সেন
বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ। পৃঃ ৫

৯। কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির—বীরেন্দ্র মিত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৫৭

১০। জৈনধর্ম—অমূল্যচন্দ্র সেন। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। পৃঃ ৫

১১। "ঋতু-উদ্গম থেকে ঋতু সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতি ২৮ দিন বা একমাস অন্তর একটি করে উইসাইট [ডিম্বাশয়ের মধ্যে তৈরি প্রাথমিক ডিমকে বলা হয় উইসাইট] পূর্ণতা লাভ করে। যোগ্যতার বিচারে নারীর ক্ষেত্রে এই সময়কাল মোটামুটি ৩৩ বছর। মাসের হিসাবে ৩৯৬, অর্থাৎ প্রায় ৪০০ মাস।"—জন্মবিজ্ঞানের ইতিহাস। রমেন মজুমদার সূত্র: নলজাতকের উপাখ্যান। পৃঃ ৭৭

১২। আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতে দেখতে পাই, ব্যাসদেব ঘৃতপূর্ণ কলসীর বন্ধ মুখ খুলতে বলেছিলেন দু' বছর পর। পাঠকেরও হয়তো মনে আছে সেই উক্তি। ভগবান্ ব্যাস গান্ধারীকে বলেছিলেন, "হে সৌবলেয়ি'! আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদ্ঘাটন করিও।' কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারতে রয়েছে 'এক বছর পর'। তিনি যে বঙ্গানুবাদ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, বেদব্যাস গান্ধারীকে উপদেশ দিলেন যে, "এক বৎসর পরে এই কলসীগুলির মুখ উদ্ঘাটন করিবে।' মূল শ্লোকে আছে।

"শশাস চৈব ভগবান্ কালেনৈতবতা পুনঃ ॥ ২২ ॥

উদ্ঘাটনীয়ান্যেতানি কুম্ভানীতি স সৌবলীম্।…২৩

—আদিপর্ব, নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

রাজশেখর বসু কর্তৃক সারানুবাদ মহাভারতেও দেখা যায় 'এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন।'

১৩। "অমিততেজঃ মহর্ষি গান্ধারী-প্রসূত মংসপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন গর্ভধারণ করেন নাই তবে কি প্রকারে দুঃশলা-নাম্নী শতাধিকা জন্ম হইল?' —কালীপ্রসন্ন, আদিপর্ব্ব, ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

১৪। "তস্মিন্ সংবৎসরে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রান্মহাযশাঃ।

জজ্ঞে ধীমাংস্ততস্তস্যাং যুযুৎসুঃ করণো নৃপ ॥ ৪১ ॥

—আদিপর্ব্ব, নবধিকশততমোঽধ্যায়ঃ দ্রষ্টব্য—মহাভারতম্ ॥

১৫। "শাপ এবং বর দুই ক্ষেত্রেই প্রায়শই ব্যবহার হত অলৌকিক ক্ষমতার। শাপ দিয়ে যে ক্ষতি করা হত তা যেমন অনেকসময় হত এত বড় ধরণের যা অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার ছাড়া করা সম্ভব হত না, তেমনি বরদানের দ্বারা যে-পরিমাণ লাভ আর-একজনের করে দেওয়া সম্ভব হত, তা ক্রমশই লৌকিক উপায়ে করা সম্ভব হত না। শাপ দেওয়ার ঘটনার মধ্যে শাপদাতার যে অবিবেচনা, হঠকারিতা আর নীতিহীনতা প্রায় ব্যতিক্রম-হীনভাবে প্রকাশ পেত, বরদানের ক্ষেত্রেও নীতির দিক-থেকে কোন উন্নতির মান লক্ষ্য করা যেত না!"

—ব্রাহ্মণ্যভাবধারা ও আধুনিক মন—অশোকরুদ্র পৃঃ ১০৪।দ্রষ্টব্য—কৃচ্ছ্র ও বরদান প্রবন্ধ।

১৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত। আদিপর্ব্ব। পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।
[বর্তমান অংশের যাবতীয় উদ্ধৃতিই কালীপ্রসন্ন থেকে গৃহীত]

১৭। "৫০৩১ এতদ্বর্ত্তমান কল্যব্দারম্ভাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিনি দিনদ্বয়াধিক—দশমাসা-ধিকৈক সপ্ততিতমে অব্দে চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ রাত্রৌ ষষ্ঠদণ্ডসময়ে শুভ তুলা লগ্নে পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত সিংহ-রাশৌ চন্দ্রে কেন্দ্রস্থে বুজে কোণস্থে বুধে উচ্চস্থে শণৌ শুক্রে চ অষ্টোত্তরীয় মতে কুজস্য দশায়াং বিংশোত্তরীয় মতে ভৃর্গোদশায়াং শ্রীযুক্তধৃতরাষ্ট্র বর্ম্মণঃ শুভ প্রথম কুমারো জাতবান্। অয়ং ক্ষত্রিয়বর্ণো নরগণশ্চেতি।"
—মহাভারতম্, আদিপর্ব্ব, ১১৭ অধ্যায়। হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ।

১৮। তং খরা প্রত্যভাষন্ত গৃধ্র গোমায় বায়সাঃ।
বাতা বিপ্রববুশ্চাপি দিগদাহশ্চাভবত্তদা ॥ ২৮ ॥ আদি, ১০৯ অধ্যায়

১৯। এইতো সেদিনের কথা। "১৯৭০ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটের ভারতীয় বংশোদ্ভূত অধ্যাপক খোরানা কোষ কেন্দ্রস্থিত প্রাণের জিন্ নামক বিশিষ্ট জৈব উপাদান সংশ্লেষণ করেন। এই জিন্ প্রাণবন্ত ছিল না। ১৯৭৬ সালে তিনি ও তাঁর সহকর্মিগণ প্রাণবন্ত জিন্ তৈয়ার করে জড়বাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" —সত্য-ধর্ম-বিজ্ঞান : ডাঃ হরেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ—৫০।

২০। অর্জুন পুত্র অভিমন্যু, তস্য পুত্র পরিক্ষিৎ, তস্য পুত্র জনমেজয়, তস্য পুত্র শতানীক এবং শতানীক পুত্র অশ্বমেধদত্ত অর্থাৎ শান্তনু থেকে অশ্বমেধ দত্ত পর্যন্ত নবম পুরুষের পরিচয় মেলে মহাভারতে।

২১। কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির—বীরেন্দ্র মিত্র। পৃঃ ৩৪০।
[যেসব রাজ্য কৌরব শিবিরে যোগদান করেছিল তাদের মধ্যে রয়েছে—সিন্ধু সৌবীর, গান্ধার, ত্রিগর্ত, কেকয়, মদ্র, কম্বোজ, মাহিষ্মতী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কোশল, অম্বষ্ঠ, বাহ্লিক, বিদর্ভ, অবন্তী, বিদেহ, বৎস্য, কলিঙ্গ, অঙ্গ, পূর্ব মগধ, পুণ্ড্র ও বঙ্গ, অহিচ্ছত্র, শূরসেন, হস্তিনাপুর ইত্যাদি]

২২। স্বর্গারোহণ পর্ব। মহাভারত—রাজশেখর বসু।
[দেবর্ষির কথা অমান্য করায় নরকদর্শন করতে হয়েছিল যুধিষ্ঠিরকে। পাপীরা যে পথে যায় সেইখানে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললেন দেবদূত। "সেই পথ তমসাবৃত, পাপীদের গন্ধযুক্ত, মাংসশোণিতের কর্দম, অস্থি, কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং মশক মক্ষিকা কৃমি কীট ও ভল্লুকাদি হিংস্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলছে, লৌহমুখ কাক, সূচীমুখ গৃধ্র এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে ; মেদরুধিরপ্রলপ্ত ছিন্নবাহু ছিন্নপদ ছিন্নোদর মৃতদেহ সর্বত্র পড়ে রয়েছে।' —রাজশেখর বসু

৮. দীর্ঘতমা

বলি রাজার বংশোৎপত্তি হয়েছিল দীর্ঘতমা মুনি থেকে। মহর্ষির ঔরসে রানী সুদেষ্ণার গর্ভজাত তাঁর পাঁচ পুত্র যথাক্রমে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে সুপরিচিত। পঞ্চ পুত্রের অধিকৃত পূর্ব ভারতের এই পাঁচটি রাজ্য অদ্যাবধি খ্যাত হয়ে আছে মহাভারতে।

পূর্বকালে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের অনেক কাহিনীই আমরা জানতে পাই নিখিল বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম ধর্মতত্ত্ববিদ্ কুলাচারাভিজ্ঞ পরম শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান পুরুষ পিতামহ ভীষ্মের মুখে। কাহিনীর সূত্রপাত অপুত্রক বিচিত্রবীর্যের অকাল মৃত্যুতে পুত্রাশোকাতুরা সত্যবতীর বিচিত্র প্রস্তাবনায়। বংশরক্ষার কারণে পুত্রবধূদের গর্ভে অপত্যোৎপাদনে বিশেষভাবে ভীষ্মকে বলতে লাগলেন তিনি, পরলোকগত রাজা শান্তনুর জল-পিণ্ড দান, ধর্ম-কীর্তি ও বংশরক্ষার যাবতীয় দায় এখন তোমার। তুমিই তাঁর আত্মার সদ্‌গতি ও শান্তির একমাত্র আশ্রয়। অতএব তুমি তোমার পরমাসুন্দরী রূপযৌবনবতী ভ্রাতৃ বধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর অথবা সিংহাসনে স্বয়ং অভিষিক্ত হয়ে দারপরিগ্রহ পূর্বক বংশরক্ষা কর। জল-পিণ্ড বঞ্চিত করে পিতৃপুরুষকে নরকে নিমগ্ন ক'রো না। অধর্মের ভাগী হ'য়ো না।

সত্যবতীর সকল কথা শ্রবণ করে প্রত্যুত্তরে ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম বললেন, আপনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালনের কথাই বলেছেন, মা। কিন্তু যে-সত্য আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তা তো আর ভাঙতে পারিনা! আমি ত্রিলোক ত্যাগ করতে পারি, ইন্দ্রত্ব বর্জন করতে পারি কিংবা তার চেয়েও যদি বেশি কিছু থাকে তাও ত্যাগ করতে পারি কিন্তু কোনমতেই সত্য ত্যাগ কত্তে পারিনা। আমি আপনার সামনেই সেই সত্য পালনের প্রতিজ্ঞা করছি আবার। শুনুন তবে, "যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর রস পরিত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশু পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্মরাজ যদি ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"[১]

পুনরায় ভীষ্মের মুখে হেন কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সত্যবতী বললেন, জানি, সব জানি। আমার জন্য যা বলেছিলে তাও জানি, বৎস। কিছুই ভুলিনি আমি। তথাপি আপদ্ধর্মে তোমাকেই বিশাল দায়িত্ব নিতে হবে।

বংশ রক্ষার তাগিদে মাতা সত্যবতী ধর্মহীন কথা বলছেন ভেবে ধর্মপরায়ণ ভীষ্ম বললেন, আপনি ধর্মের প্রতি নজর দিন। আমাদের সকলকে বিনষ্ট করবেন না। ক্ষত্রিয়ের ধর্মভ্রষ্ট হওয়া অতিশয় নিন্দনীয়। তবে যাতে শান্তনুর বংশ রক্ষা পায় তার উপায় হিসাবে ধর্মসম্মত ক্ষত্ররীতির কথাই বলছি আপনাকে। আপনি আপদ্ধর্মকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণের সঙ্গে লোকাচার পর্যালোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন্।

অতঃপর, ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ভীষ্ম বললেন, অতীতে জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন পৃথিবী।২ তৎকালে পতিহীনা ক্ষত্রিয়া নারীগণের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান লাভ করেছিলেন আপদ্ধর্মানুযায়ী। কেননা বেদে বলা হয়েছে যে, ক্ষেত্রজপুত্র বিবাহকারীরই পুত্র। অথএব যথোচিত অর্থ প্রদানপূর্বক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের গর্ভোৎপাদন বিধেয়। এ-বিষয়ে দীর্ঘতমা নামক গোধর্ম অবলম্বনকারী এক মুনির কথা বলছি আপনাকে। পূর্বকালে উতথ্য বলে একজন সুখ্যাত ঋষি ছিলেন। তাঁর পরমা সুন্দরী পত্নীর নাম ছিল মমতা। একদিন মহর্ষি উতথ্যের যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত বৃহস্পতি অত্যন্ত কামাতুর অবস্থায় মমতার কাছে হাজির হয়ে তার সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। মমতা দেবরকে সম্বোধন করে বললেন, মহাভাগ। আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার দ্বারা অন্তর্বত্নী হয়েছি। আমার গর্ভস্থ সেই সন্তান বেদ-অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছে। তুমিও অমোঘরেতাঃ। একই গর্ভে দুটি সন্তানের অবস্থান নিতান্তই অসম্ভব। অতএব এমন অবস্থায় আপনি আজ সঙ্গমে বিরত থাকুন।৩ কিন্তু বৃহস্পতি তখন প্রবল পার্থিব প্রবৃত্তি দমনে একান্তই অপরাগ। মমতার অসম্মতি সত্ত্বেও জোরপূর্বক উপগত হলেন তিনি। সেই সময়ে মমতার গর্ভস্থ সন্তান বৃহস্পতিকে বলেছিল, ভগবন্! মদনবেগ সংবরণ করুন। কারণ এখানে দু'জনের থাকবার জায়গা নেই। আমি পূর্বে এই গর্ভে জন্মেছি। আপনার অব্যর্থ বীর্যপাতে আমাকে বিব্রত করা আপনার অনুচিত। প্রবৃত্তির তাড়নায় গর্ভস্থ শিশুর কথায় কর্ণপাত করলেন না পিতৃব্য বৃহস্পতি। চরম মুহূর্তে পা দিয়ে শুক্রের গতিপথ রুদ্ধ করে দিল সেই মুনিবালক। ফলে শুক্র জরায়ুতে প্রবেশ করতে না পেরে মাটিতে

এসে পড়ল সহসাই। এতে প্রভাবশালী বৃহস্পতি গর্ভস্থিত শিশুকে অভিশাপ দিলেন এই বলে যে, সমস্ত প্রাণীর অভিষ্ট সময়ে এমন ব্যবহার করলি তার জন্য যাবজ্জীবন অন্ধ হয়ে থাকবি তুই! বৃহস্পতির শাপে অন্ধ হয়ে জন্মালেন দীর্ঘতমা।

"সেই জন্মান্ধ বেদবিৎপ্রাজ্ঞ ঋষি স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষী নাম্নী এক পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি গৌতম প্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া মহর্ষি উতথ্যের বংশ-রক্ষা করিলেন। অনন্তর বেদ বেদাঙ্গ পারগ ধর্মাত্মা দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।৪" মুনিগণ ক্রোধান্ধ হয়ে সেই গোধর্ম অবলম্বনকারী অন্ধ মুনির সংস্রব ত্যাগ করলেন অচিরে। পত্নী প্রদ্বেষীও একান্ত বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকেন অন্ধপতি দীর্ঘতমার প্রতি এবং স্পষ্টতই বললেন যে, তিনি অন্ধস্বামীর ভার বহন করতে পারবেন না আর।৫

স্বীয় পত্নীর মুখ থেকে এমন অভক্তি আর অশ্রদ্ধার উক্তি শুনে সমস্ত স্ত্রী জাতির প্রতি অভিসম্পাত দিলেন দীর্ঘতমা, আমি আজ থেকে জগতের তাবৎ স্ত্রীলোকের জন্য এই নিয়ম সৃষ্টি করে যাচ্ছি যে, যাবজ্জীবন পতিই হবে তাদের পরম গতি। পতির জীবিত বা মৃতাবস্থায় অন্য পুরুষ সংসর্গে পতিতা হতে হবে তাদের। ধন-সম্পত্তি-যৌবন ভোগে লাগবে না বিধবা নারীদের। ভোগে প্রবৃত্ত হলে নিন্দা-পরিবাদের অন্ত থাকবে না আর।৬

স্বামীর এই অভিসম্পাতের কথা শুনে অত্যন্ত কুপিতা প্রদ্বেষী পুত্রগণকে ডেকে বললেন, 'একে গঙ্গায় ফেলে দাও!' সংসারের নানা লোভ-মোহে আক্রান্ত গৌতমাদি পাষাণহৃদয় পুত্রগণ জলে ভাসিয়ে দিল অন্ধ পিতাকে এবং এই কথা বলতে বলতে ঘরে ফিরে গেল যে, কেন আমরা এই বৃদ্ধ অন্ধের ভরণ-পোষণ করব সারাজীবন?

বহুদেশ অতিক্রম করে ভেসে চলেছেন দীর্ঘতমা। একদিন পরম ধার্মিক বলিরাজা গিয়েছেন গঙ্গাস্নানে। স্রোতের বেগে আগত ভাসমান মুনিকে দেখতে পেলেন রাজা। তাঁকে জল থেকে তুলে পরিচয় নিলেন বলি। অন্ধ মুনির সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হয়ে রাজা বললেন, আপনি আমার পত্নীর গর্ভে ধর্মার্থকুশল পুত্রোৎপাদন করুন। ঋষি বললেন, তথাস্তু! কিন্তু রাজমহিষী দীর্ঘতমাকে অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ দেখে তাঁর কাছে গেলেন না। পরিবর্তে ধাত্রী

কন্যাকে পাঠালেন। শূদ্র জাতীয়া ধাত্রী কন্যার গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রমুখ একাদশ পুত্রের জন্ম দিলেন দীর্ঘতমা। রাজা বলি তাদের নিজপুত্র বলে দাবী জানালে ঋষিবর বললেন, না, এরা আমারই পুত্র, আপনার রানী অশেষ অবজ্ঞা এবং প্রতারণা করেছে আমাকে। রাজা বলি মুনিকে প্রসন্ন করে রানী সুদেষ্ণাকে পাঠালেন তাঁর কাছে। মহিষীর অঙ্গস্পর্শ করে দীর্ঘতমা বললেন, তোমার গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্ম নেবে। তারা যেমন তেজস্বী তেমনই সুশাসক হবে। এভাবেই বলি রাজার বংশ বিস্তৃত হল ভারতে। এমন কাহিনী শুনিয়ে সত্যবতীকে বললেন ভীষ্ম, এইবার আপনার যেমন অভিরুচি তাই করুন!

ভীষ্ম কথিত এই কাহিনী থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, মহাভারতের যুগের অনেক আগেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সমঝোতার মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল অবধারিত। তথাপি পরশুরাম যে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন পৃথিবী তার কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। সেকালে পুরোহিত-শ্রেণী যে অতিশয় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তার ইঙ্গিত মেলে এই কাহিনী থেকে। আবার রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের ভীষ্মের হাতে তাঁর পরাজয়ে স্বীকৃত হয়েছে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্য। বস্তুতঃ সমাজে নবোদ্ভুত পুরোহিতশ্রেণীর দাবী ক্ষত্রিয়কুল কর্ত্তৃক সহজে স্বীকৃত হয়নি। ভীষণ শ্রেণীসংঘর্ষ, রক্তপাত ও অত্যাচারের পর দাবী আদায় করে নিতে পেরেছিল তাঁরা এবং কালক্রমে পরিণত হয়েছিল সুবিধাভোগী শ্রেণীতে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সঙ্গে পরশুরামের সংঘর্ষ এবং তৎকর্ত্তৃক একুশবার নিক্ষত্রিয়করণ বিষয়ে পার্জিটারের অভিমত ভিন্ন।৭ অন্যপক্ষে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র সুভৌম কর্ত্তৃক একুশবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করবার কাহিনী বলা হয়েছে 'হরিবংশ পুরাণ', 'সুভৌম চরিত' ইত্যাদি জৈনগ্রন্থসমূহে। আসলে এ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য জনশ্রুতির পাল্টা জবাব।

বেদ রচনার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগে তথাকথিত চাতুর্বর্ণ এবং পুরোহিতবাদ ছিলনা অন্তত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন স্বচ্ছন্দে।৮ যজুর্বেদের যুগে উদ্ভব হয়েছে চাতুর্বর্ণ বা চারিশ্রেণীর। তবে পরবর্ত্তীকালের মত অত কড়াকড়ি ছিলনা জাতপাতের। শ্রেণীসংগ্রামের অনেক স্তুতি বা গান সন্নিবেশিত হয়েছে অথর্ববেদে। অনেক বাদ-প্রতিবাদ-অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য শ্রেণীর প্রতি। ঘটেছে শ্রেণী সংগ্রাম। কাজেই পার্জিটারের ব্যাখ্যানুযায়ী দুই পরিবারের যুদ্ধ বলে এড়িয়ে যাওয়া চলেনা সেকালের শ্রেণীসংগ্রামকে। পার্জিটারের

মতের সঙ্গে তাই মত মেলে না অনেক ঐতিহাসিকের।[৯] আর্যগণের ভারতে আগমনকালে সকলেই ছিলেন যোদ্ধা। বসতি স্থাপনের পর 'বিশ' থেকে বিশপতির অর্থাৎ রাজার আবির্ভাব। রাজার স্তুতিগায়কেরা হলেন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। কালক্রমে উভয়শ্রেণীর মধ্যে ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে শ্রেণীদ্বন্দ্ব। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব মিটমাটের পর 'বিশ'-সংশ্লিষ্ট স্বাধীন জনসাধারণ থেকে জন্ম নেয় তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য বা ব্যবসায়ী। অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেরই উদ্ভব স্থল বিশ্ব বা বিশ। শূদ্রের উৎপত্তি নিয়ে নানা মতভেদ সত্ত্বেও বলা চলে যে তারা বর্ণের অন্তর্গত একটি শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত। শূদ্রের নীচে যে সব শ্রেণী ছিল তাদের বলা হয় ব্রাত্য, শ্রেণীহীন বা জাতিবিহীন জনতা।

অতঃপর ভীষ্ম দীর্ঘতমার জন্ম বিষয়ে যে কাল্পনিক গল্পকথা শুনিয়েছেন আমাদের কাছে তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনই অবাস্তব। কেননা কে কবে শুনেছে গর্ভের সন্তান বেদপাঠ করে? আমরা জানি, শিশুর বাক্‌স্ফূর্তি ঘটে জন্মের অনেক পরে। এমনকি জরায়ুর মধ্যে ন' মাস বসবাস কালেও শিশু না নেয় শ্বাস-প্রশ্বাস, না করে খাদ্য হজম, সন্তানের পক্ষে মা-ই করে দেন এই আবশ্যিক কাজগুলি। একটা স্তর পর্যন্ত গর্ভস্থ মানব শিশু এবং পশুভ্রূণের কোনও পার্থক্য থাকে না। যতদিন যায় তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে পার্থক্য। জন্ম মুহূর্তে শিশুর প্রথম ক্রন্দন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার। মহাভারতকার মমতা এবং তার গর্ভস্থ সন্তানের মুখ দিয়ে যে উক্তি করিয়েছেন তাও অযৌক্তিক। মমতা বলেছেন, তুমিও অমোঘরেতা। এক গর্ভে দুটি সন্তানের জন্মসম্ভব নিতান্তই অসম্ভব। অতএব এমন অবস্থায় আপনি আজ সঙ্গমে বিরত থাকুন।

জন্ম বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং তার পরিভাষায় দড় না হয়েও আমরা জানি প্রকৃতির মত নারীর জীবনেও আছে এক ঋতু চক্র। "তার দেহে মাতৃত্বের সম্ভাবনা নিয়ে গর্ভধারণের ঋতু ফিরে ফিরে আসে। আসে মাসে মাসে। অর্থাৎ একমাস অন্তর অন্তর। সঠিক হিসাবে ২৮ দিন পর পর। বয়ঃ সন্ধিক্ষণে এ ঋতুচক্রের শুরু, প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তদেশে শেষ। বয়সের হিসাবে ১৫ থেকে ৪৫ কিংবা আরও একটু বেশি। নারী-দেহে তাই মাসে মাসে একটি করে জীবনসম্ভাবনার কুঁড়ি ফোটে, পুরুষবীর্যের স্পর্শ না পেলে সে সম্ভাবনা ঝরে যায়। এখানে কুঁড়ি নারীর ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন একটি পক্ব ডিম্বকোষ, পুরুষবীর্যের শুক্রাণুর সঙ্গে যুক্ত হলে যা পরিণত হয় আদি ভ্রূণে।"[১০] জীববিজ্ঞানের ভাষায়

আদিমতম ভ্রূণটিকে বলা হয় জাইগোট। গর্ভাধানের পরমুহূর্ত্ত থেকেই কোষ বিভাজন শুরু হয়ে যায় এই জাইগোটে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে দুই থেকে চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল চলতে থাকে ক্রমান্বয় সংখ্যাবৃদ্ধি। ইতিমধ্যে ভ্রূণটিও ধীরে ধীরে ফ্যালোপিয়ান নল পেরিয়ে গিয়ে হাজির হয় জরায়ুতে। জরায়ুর গায়ে সেটি সার্থকভাবে গাঁথা পড়লেই নারী হন গর্ভবতী। তখন থেকেই তিনি মা।

গর্ভাধান সংগঠিত হলে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত আর ঋতুমতী হননা নারী। গর্ভাধান ব্যর্থ হলে ঋতুস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় পরিপক্ক ডিম্বাণুটি। এই ঋতুস্রাবের অর্থ গর্ভধারণের একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু। একটি সৃষ্টিশীল বীজের নিষ্ফল পরিণতি। "রজস্রাবের এই বেদনা যেন ব্যর্থতার আর্তি। মাতৃজঠরের নিঃশব্দ ক্রন্দন। বিজ্ঞানীরা তাই রজঃস্রাবকে বলেছেন 'ক্রাই অভ দি উম্'।"১১ রজঃস্রাবের সঙ্গে সন্তান জন্মের সম্পর্ক ওতপ্রোত জড়িত। মাতৃগর্ভে দীর্ঘতমা বেড়ে ওঠার পর নিশ্চয়ই আর ঋতুমতী হননি মমতা। কাজেই যতই অমোঘ-রেতা হোন না কেন বৃহস্পতি সন্তানের জন্ম সম্ভব ছিলনা' কোনমতেই। ব্যাসদেবও তা জানতেন বৈকি। অদ্ভুত এক কাল্পনিক গল্পের আশ্রয়ে এই সত্যই প্রমাণ করেছেন তিনি। মা মমতা এবং সন্তান দীর্ঘতমার মুখ দিয়ে ব্যাসদেব তাই বলেছেন, একই গর্ভে দুটি সন্তানের জন্মসম্ভব নিতান্তই অসম্ভব।

ব্যাসদেব তুখোড় গল্পকার। সরাসরি কিছুই বলেন না তিনি। যা বলার গল্পের মাধ্যমেই তা বলেছেন আমাদের। অনেক সময়, আপাতদৃষ্টিতে গল্পের অবাস্তবতায় আমরা দ্বিধায় পড়ি, ধাঁধায় ঘুরপাক খাই, হতভম্ব হই আকস্মিক। বর্ত্তমান গল্পে মমতার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও জোরপূর্ব্বক উপগত হলেন বৃহস্পতি। সেই সময়ে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান পিতৃব্যকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'ভগবান্! মদনবেগ সংবরণ করুন। কারণ, এখানে দু'জনের থাকবার জায়গা নেই। আমি পূর্বে এই গর্ভে জন্মেছি। আপনার অব্যর্থ বীর্যপাতে আমাকে বিব্রত করা আপনার অনুচিত।' কিন্তু অজাত শিশুর কথায় কর্ণপাত করেননি ভগবান বৃহস্পতি। যে কারণে তাঁর চরম মুহূর্তে পা দিয়ে শুক্রের পথরোধ করে দিয়েছিল সেই মুনিবালক। এ থেকে কি আমরা বুঝে নেব যে, আসন্ন প্রসবা ভ্রাতৃবধুর উপর বলাৎকার করেছিলেন বৃহস্পতি? না হলে কোনও গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে পা দিয়ে বীর্যপাত প্রতিরোধের প্রশ্ন ওঠে না আদপেই। কেননা গর্ভের প্রতিটি সন্তানই আবদ্ধ থাকে 'অ্যামনিয়ন' নামক

থলির মধ্যে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ঠিক আগেই ফেটে যায় অ্যামনিয়ন থলিকাটি। সাধারণত জন্মমুহূর্তে শিশুর মাথাটি বেরিয়ে আসে আগে। পরে পা। ক্ষেত্রবিশেষে আগে পা, পরে মাথা। ঘটনাচক্রে অ্যামনিয়ন থলিকাটি ফেটে না গেলে ডাক্তার বা ধাত্রীকে আবরণ কেটে মুক্তির আলো দেখাতে হয় শিশুকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এমন উদ্ভট গল্প ফাঁদতে গেলেন ব্যাসদেব? আমাদের মনে হয়, দেবপুরোহিত বৃহস্পতির লাম্পট্যকে ধিক্কার জানাবার ভাষা জানা ছিলনা তাঁর। সেকালের রীত্যানুযায়ী ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক দোষের ছিল না কোনও। কিন্তু যে অবস্থায় বৃহস্পতির ন্যায় বিচক্ষণ দেবপুরোহিত পূর্ণ গর্ভিনী এক নারীকে ধর্ষণ করেছে অবলীলায় তাঁকে লজ্জা দিতে পারে শুধু গর্ভস্থ সন্তানই।

আলোচনার শেষে দু'একটি কথা কেবল বলার থাকে দীর্ঘতমা মুনি প্রসঙ্গে। আপাতদৃষ্টিতে দীর্ঘতমাকে মনে হতে পারে লম্পট চরিত্রহীন বলে। কিন্তু ঋষি সৌরভয়ের শিষ্য হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিখিল গোধর্মা বৃত্তি। এতে দোষের ছিল না কিছু। পত্নীদের মনোরঞ্জনে অক্ষম মুনিরাই সমাজচ্যুত করতে চেয়েছে তাঁকে। পারেনি। অতঃপর তাঁর পত্নী প্রদ্বেষীর মনে জ্বালিয়েছে বিদ্বেষের আগুন। পুত্রদের সহায়তায় তাঁকে জলে ফেলেছে প্রদ্বেষী।

দীর্ঘতমাকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন রাজা বলি। অপুত্রক রাজা রানী সুদেষ্ণার গর্ভে ধর্মার্থকুশল পুত্রোৎপাদনে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু রানী দীর্ঘতমাকে বৃদ্ধ ও অন্ধ দেখে অবজ্ঞা করে ধাত্রীকন্যাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। একাদশ পুত্র উৎপাদনের পর রাজা বলি সেই সকল পুত্রদের নিজের বলে দাবী করলেও অস্বীকার করেছেন দীর্ঘতমা। প্রচলিত সমাজব্যবস্থানুযায়ী ক্ষেত্রজপুত্র বিবাহকারীরই পুত্র। কিন্তু ধাত্রীকন্যা রাজার বিবাহিত স্ত্রী নহেন। রানীর দাসী স্থানীয়া মাত্র। লক্ষ্যণীয় যে যুগাধিককাল দীর্ঘতমার সংস্পর্শে আসেননি রানী সুদেষ্ণা; তার পরিবর্তে পাঠিয়েছেন তাঁর ধাত্রীকন্যাকে। সেই ধাত্রীকন্যার গর্ভে একাদশপুত্রের জন্ম দিয়েছেন মহর্ষি দীর্ঘতমা। রাণী তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন কিন্তু শূদ্রাজাতীয়া ধাত্রীকন্যার সে অধিকার ছিলনা। রানী নির্দেশে অন্ধকে অন্ধের মতই মেনে নিতে হয়েছে তাঁকে। সে যুগে শূদ্রদের যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতালাভের অধিকারটুকু পর্যন্ত ছিল না সমাজে সেই সত্যই গল্পচ্ছলে তুলে ধরেছেন মহাভারতকার ব্যাসদেব।

উদ্ধৃতি ও নির্দেশক

১। ত্যজেচ্চ পৃথিবী গন্ধমাপশ্চরসমাত্মনঃ।
জ্যোতিস্তথা ত্যজেদ্রূপং বায়ু স্পর্শগুণং ত্যজেৎ ॥ ১৭ ॥
প্রভাং সমুৎসৃজেদর্কো ধূমকেতুস্তথোষ্ণতাম্।
ত্যজেচ্ছব্দং সোমঃ শীতাংশুতাং ত্যজেৎ ॥ ১৮ ॥
বিক্রমং বৃত্রহা জহ্যাদ্ধর্ম্মং জহ্যাচ্চ ধর্ম্মরাট।
ন ত্বহং সত্যমুৎস্রষ্টুং ব্যবস্যেয়ং কথঞ্চন ॥ ১৯ ॥

—আদিপর্ব্ব, সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

২। পূর্বকালে জামদগ্ন্য পরশুরাম পিতৃবধ সহ্য করতে না পেরে হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাকে কুঠার দ্বারা হত্যা করেন। তিনি মহাবীর্যবান কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্রবাহু ছেদন করে সেই রক্তে পিতৃতর্পণ-দ্বারা লোকের পক্ষে অতি দুষ্কর ধর্ম্মার্জ্জন করেন। পরন্তু ধনুধারণ পূর্বক নিদারুণ অস্ত্রপ্রয়োগে একুশবার ক্ষত্রিয় কুল নির্মূল করেন বলে কথিত আছে। এক্ষেত্রে আরও স্মরণীয় যে, পরশুরাম পিতা জমদগ্নির নির্দেশে কুঠার দ্বারা মা রেণুকার শিরচ্ছেদ করেছিলেন। এই কাহিনী থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে মাতৃ তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিলেন। কি অপরাধ ছিল রেণুকার? একদা স্নান করতে গিয়ে মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথকে পত্নীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে দেখে কামাসক্তা হয়ে সেই রাজাকে কামনা করেছিলেন মনে মনে। জমদগ্নির চোখে এই অপরাধে অপরাধিনী হলেন তিনি। অথচ প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চিত্ররথের সঙ্গে কামক্রীড়ায় রত হলেও স্বামীর নির্দেশে পুত্রের হাতে নিহত হতে হত না তাঁকে। এ থেকে বোঝা যায়, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দিন ফুরিয়ে এসেছিল তৎকালে। নতুবা জমদগ্নিকে ঋষি উদ্দালকের মতই বলতে হত—"বৎস! ক্রোধ করিও না, ইহা নিত্যধর্ম্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সমজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মে লিপ্ত হয় না।"

৩। উবাচ মমতা তন্তু দেবরঃ বদতাং বরম্।
অন্তর্ব্বত্নী ত্বহং ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেনারম্যতামিতি ॥ ১১ ॥
অয়ঞ্চ মে মহাভাগ! কুক্ষাবেব বৃহস্পতে।
ঔতথ্যো বেদমত্রাপি ষড়ঙ্গ প্রত্যধীয়ত ॥ ১২ ॥

—আদিপর্ব্ব, অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

৪। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত।

—আদিপর্ব্ব, চতুরাধিকশততম অধ্যায়।

৫। ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং তদা।
নিত্যকালং শ্রমেনার্ত্তো ন ভবেয়ং মহাতপঃ ॥ ৩০ ॥

আদিপর্ব্ব, অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে ভরণ করেন বলেই তাঁকে ভর্ত্তা বলে আর পালন করেন বলেই বলে পতি কিন্তু আমি তোমার ও তোমার পুত্রদের ভরণ-পোষণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমি আর আপনার ভরণ করিতে পারিবনা।

৬। অদ্যপ্রভৃতি মর্যদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্ ॥ ৩৩ ॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
অপতীনাস্তু নারীণামদ্য প্রভৃতি পাতকম্।
অস্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগা ভবন্তু তাঃ।
অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ ॥ ৩৫ ॥

—আদি. অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

[সমাজে পুরুষ প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং নারীর অধিকার ক্রমাগত ক্ষুন্ন হয়ে চলছিল এই শ্লোক-গুলিই তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ]

৭। "এই যুদ্ধের ব্যাখ্যা পার্জিটার কিন্তু অন্যভাবে করিয়াছেন। তিনি মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া (১,১৭৮, ৬৮০, ২-১৫) বলিতেছেন এই যুদ্ধটি হৈহয় বংশীয় কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রদের সহিত তাহাদের পুরোহিত বংশীয় ভার্গবদের মধ্যে আরম্ভ হয়। কার্ত্তবীর্য্যার্জুন ভার্গবদের অনেক ধন প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুরপর তাঁহার ভার্গবদের উহা প্রত্যর্পণ করিতে বলে; তাহারা প্রত্যর্পণ—প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে হৈহয় রাজপুত্রেরা বলপূর্ব্বক ঐ ধন কাড়িয়া লয়। ইহাতে ভার্গবেরা অন্য দেশে পালাইয়া যায়, এবং উত্তরে ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। ইহাদের বংশ জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অযোধ্যার রাজবংশে বিবাহ করেন। ইহারই পুত্র পরশুরাম। অর্জুন কার্ত্তবীর্য্য তাহার দিগ্বিজয়ের সময় জমদগ্নিকে উত্যক্ত করে। ইহাতে বিবাদ বাধে এবং অর্জুনের পুত্রগণ জমদগ্নিকে মারিয়া ফেলে। পরশুরাম প্রতিহিংসায় অর্জ্জুনকে ও অনেক হৈহয়কে নিহত করে। তত্রাচ হৈহয়রা বহুকাল পর্যন্ত অভিযান করিয়া উত্তর ভারত ছারখার করিয়া ফেলিত। অবশেষে অযোধ্যার রাজা সগর তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া হৈহয় শক্তি ধ্বংস করে। পার্জিটারের মতে এই গল্পই ব্রাহ্মণেরা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়া পরশুরাম কর্তৃক একুশবার নিক্ষত্রিয় করণে খাড়া করিয়াছে। বাল্মিকির রামায়ণেই প্রথমে এই ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় আখ্যা আসে। পরে মহাভারতে আসে। কিন্তু এই দুই কাব্যেই শেষে

পরশুরামের পরাজয়ের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জনশ্রুতি এবং রাম ও ভীষ্ম কর্তৃক পরশুরামের পরাজয়ের কথা বলিয়া ক্ষত্রিয়দের সম্মান বাঁচাইয়াছে'

(Pasgiter—"Ancient Indisn Histrorical Tradition" ; PP. 199-200).

Source : ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (পৃঃ ১০৪,)

৮। "তথাকথিত চাতুর্বর্ণ ও পুরোহিতবাদ বেদের প্রাচীনাবস্থায় বর্তমান ছিল না, বরং বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজাদের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার কথা (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪, ১, ৫,২) উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি তাহার কন্যা রোমসাকে ক্ষত্রিয় রাজা স্বনর ভবয়ভ্যের সহিত বিবাহ দিয়াছেন (১, ১২৬, ৬-৬), ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা বেদের অনেকগুলি শ্লোক রচিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এমন কি বৈশ্যের দ্বারাও বৈদিক গান রচিত হইয়াছে ; অনেক ক্ষত্রিয় রাজার নিকটও ব্রাহ্মণগণ "ব্রহ্ম বিদ্যা' শিক্ষার জন্য গমন করিতেন। "শতপথ ব্রাহ্মণে' উক্ত আছে যে, রাজা জনক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।"

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (পৃঃ ৯৪)

৯। 'এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ওয়েবার ও নি'মার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত পার্জিটারের ব্যাখ্যা মিলে না। যদি বহু বর্ষ ব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধ দুইটি বংশের ব্যক্তিগত ঝগড়ার সহিত দুইটি ক্ষত্রিয় রাজবংশের আধিপত্যের কলহে মিলিত হওয়াতে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা কেন রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত পরশুরামের পরাজয়ের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে? বহুপরে "মহাবীর চরিত' গ্রন্থে ভবভূতিও ক্ষত্রিয়কে শাসক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক পরশুরামের পরাভব ঘটাইয়াছেন। মূলতঃ ইহা শ্রেণী সংগ্রামেরই পরিচায়ক। আর শতরুদ্রিয়ের শ্লোকে (যজুর্বেদ ১৬, ১, ২১) "তস্করাসাং পতয়ে নমঃ' প্রভৃতি এবং অথর্ব বেদের রাজন্যদের দ্বারা ব্রাহ্মণের স্ত্রী লুণ্ঠন ও গরু মারিয়া খাওয়ার কাতরোক্তি কেন উল্লিখিত হইবে? আবার পার্জিটার ভুলিতেছেন তিনি রামায়ণের গল্প বাদ দিয়াছেন, মহাভারতের এই গল্পও ব্রাহ্মণের দ্বারা রচিত, তাহাতে শ্রেণী সংগ্রাম লুক্কায়িত করা হইলেও পরশুরামের পরাজয় স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়দের পক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া হওয়া হইয়াছে। আবার সিমার ও লাসেম মহাকাব্যসমূহ মধ্যে এই শ্রেণী-সংগ্রামের স্মৃতি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হতে দেখেন।'

—ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি। পৃঃ ১০৪

১০। জন্মবিজ্ঞানের ইতিহাস (নল জাতকের উপাখ্যান)—রমেন মজুমদার (পৃঃ ৬৯)

১১। ঐ — পৃঃ ৬৯

—ঃ সমাপ্ত ঃ-